Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্ম ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদ ফাতিহা রশিদ

রোলঃ 23090120167

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্ম ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদ ফাতিহা রশিদ

রোলঃ 23090120167

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ধর্ম ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাহিদ ফাতিহা রশিদ, আইডিঃ 23090120167 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

<u>এক্সটারনালঃ</u>

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ধর্ম ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং সত্য ধর্ম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাহিদ ফাতিহা রশিদ

(স্বাক্ষর)

নাহিদ ফাতিহা রশিদ

আইডিঃ 23090120167

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ধর্ম কেন? 6

অধিবিদ্যাগত বিষয়ে কার কী মত? 7

মানুষের আসল মর্যাদা ও অবস্থান 8

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য 9

আল্লাহ তাআলাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক 16

পরম আনুগত্য কেবল স্রষ্টার অধিকার 17

ঈমানের দুটি মৌলিক দিক 20

মানবজাতিকে হিদায়াত দিয়েই প্রেরণ করা হয়েছে 21

নবীদের মিশন 22

নবী-রাসূলদের জ্ঞান আল্লাহ-প্রদত্ত 24

নবী-রাসূলদের চেষ্টা-সংগ্রাম 25

স্রষ্টার পূর্ণাঙ্গ ধারণা 29

স্রষ্টা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 30

মানুষকে দেয় সঠিক মর্যাদা 32

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা: দুটো কথা 40

কম্যুনিজম 43

মানবীয় মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত সার 43

যুবকদের প্রতি আহ্বান 59

ধর্ম কেন?

ধর্ম-বিশ্বাস এগুলোর আসলে কী দরকার? এগুলোর কি মানবজাতির আদৌ দরকার আছে? এগুলো থাকলেই কী আর না থাকলেই বা কী—এ ধরনের প্রশ্নাবলী মানুষের অন্তরে আগেও এসেছে, এখনো আসছে। আসতে থাকবে সামনেও। তাই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আগে জানতে হবে—ধর্ম আসলে কী? ধর্মের সংজ্ঞায় আসলে নানা মুনির নানা মত পাওয়া যায়। কেউ হয়তো বলবে,

ধর্ম হলো মানুষের সাথে জড়িত এমন একটি বিষয়, যার কারণে মানুষ কোনো কিছুকে পবিত্র, সম্মানিত, পরম, আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক কিংবা বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করে। এছাড়াও মানুষের ইহজাগতিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সম্পৃক্তির পথ-পদ্ধতি ও মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনে তাদের ভাগ্য নিয়েও ধর্ম আলোচনা করে থাকে। (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা)

আবার কেউ বলবে,

(ধর্ম হলো) ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতিক কোনো কিছুর উপাসনা বা সেবা- খেদমত। (মেরিয়াম-ওয়েবস্টার ডিকশনারি)

এ ধরনের আভিধানিক অর্থ থেকে সরে এসে, আমরা যদি ধর্মের ব্যাবহারিক সংজ্ঞার দিকে লক্ষ করি, তবে যা পাব তা হলো : "ধর্ম হলো মৌলিক অধিবিদ্যাগত কিছু বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি।"

আমরা মানুষ হিসেবে সীমাবদ্ধতার অধিকারী। আমরা যা দেখি, তা-ই যে বাস্তব সত্য (reality) এমনটা নয়। অনেক সময় আমরা চর্মচক্ষুতে যা দেখি বাস্তবতা হন তার বিপরীত। অথবা তার চাইতে আরও অনেক বেশি বিস্তৃত ও প্রশস্ত। ভৌত-বাস্তবতার যা চোখে দেখা যায় বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে বোঝা যায়—উকে এসকল বিষয়গুলোকেই বলা হয় অধিবিদ্যা বা (Meta- Physics)।

এ ধরনের অধিবিদ্যক বিষয়গুলো হলো : সৃষ্টির প্রারম্ভ ও প্রক্রিয়া, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, প্রাণের উৎপত্তি, মানুষের উৎপত্তি, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য, জগতে মানুষের প্রকৃত অবস্থান (position), ইহজগতের আসল প্রকৃতি, জ্ঞানের উৎস, বাস্তবতার (Reality) প্রকৃতি, মন-চৈতন্য-আত্মার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি, নৈতিকতা, নৈতিকতার সঠিক পথ ও পদ্ধতি, মৃত্যু, মৃত্যুর পরের জীবন ইত্যাদি। একটু অপরিচিত মনে হলেও ধর্মের ব্যাবহারিক সংজ্ঞা অনেকটা এরকমই। এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর একেকজন একেকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আর এভাবেই অনেক অনেক ধর্ম ও দর্শনের সৃষ্টি। কেউ এসব প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিয়ে

হয়েছে ধর্ম, কেউ কেউ আবার নেতিবাচক উত্তর দিয়েও হয়েছে ধর্ম। আবার কেউ কেউ নেতিবাচক উত্তর দিয়ে হয়েছে আস্তিক, আবার কেউ কেউ হয়েছে নাস্তিক। আমরা বিষয়টা একটি টেবিলের মাধ্যমে দেখে নিই। তবে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : নিম্নের তালিকায় নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদীদের যে অবস্থান পেশ করা হয়েছে তা যে সকল নাস্তিকদেরই অবস্থান—এমনটা নয়। তবে এমন অবস্থানও বেশ কিছু একাডেমিকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের কাছে মনে হয়েছে, নাস্তিকদের মৌলিক অ-বিশ্বাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে নিশ্চিতভাবে এর যৌক্তিক আবশ্যিক ফল এরকমই দাঁড়াবে।)

অধিবিদ্যাগত বিষয়ে কার কী মত?

স্রষ্টা কি এক না অনেক?	**স্রষ্টা কি আছেন?**	**মৌলিক অধিবিদ্যাগত প্রশ্ন**
অবশ্যই এক ও অদ্বিতীয়	হ্যা	ইসলাম
এক তবে তাঁর বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে	হ্যা	হিন্দুধর্ম
এ প্রশ্নের উত্তর জানার সাথে মানুষের মৌলিক উদ্দেশ্যের কোনো সম্পর্ক	নীরব অথবা স্রষ্টা নেই	বৌদ্ধধর্ম
অবশ্যই এক, তবে যীশু ও পবিত্র আত্মাও তাঁর ঐশ্বরিকত্বের প্রকাশ। একের মাঝে তিন, তিনের মাঝে এক	হ্যা	খ্রিষ্টধর্ম
স্রষ্টাই যখন নেই, তখন তিনি এক বা একাধিক হন কীভাবে?	না	নিরীশ্বরবাদ /নাস্তিকতা

মানুষের উৎপত্তি	প্রাণের উৎপত্তি	গোটা 'সৃষ্টিজগৎ' কীভাবে সৃষ্টি
স্রষ্টা অন্যান্য প্রাণের মত মানুষেরও উৎপত্তি ঘটিয়েছেন	স্রষ্টা প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়েছেন	হয়েছে?
গোটা সৃষ্টিজগতের মতো মানুষের জীবাত্মাও মহান পরমাত্মার প্রকাশ	আসলে গোটা সৃষ্টি ও প্রাণ-আত্মা মূলত সেই পরমাত্মারই প্রকাশ	স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন
এর জবাব দেওয়া বা না দেওয়ার সাথে মানুষের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই	এর উত্তরের কার্যত কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই	স্রষ্টা সৃষ্টিজগতের মাধ্যমে নিজের প্রকাশ ঘটিয়েছেন
স্রষ্টা অন্যান্য প্রাণের মত মানুষেরও উৎপত্তি ঘটিয়েছেন	স্রষ্টা প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়েছেন	এ ব্যাপারে কার্যত নীরব
মানুষ বানরজাতীয় কোনো এক প্রাণী থেকে দীর্ঘসময় ধরে বিবর্তিত হতে হতে আজকের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।	প্রাণ খুব সম্ভবত কোনো সমুদ্রে প্রথম উদ্ভব হয়েছিল, হতে পারে কোনো মহাজাগতিক প্রাণী বা এলিয়েন পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়ে গেছে	স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন

মানুষের আসল মর্যাদা ও অবস্থান

- ❖ মানুষ স্রষ্টার অন্যান্য সৃষ্টি থেকে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত এক সৃষ্টি। সে স্রষ্টার পক্ষ থেকে বিশেষ এক দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- ❖ মানুষ পরম ব্রহ্ম স্রষ্টার একটি অংশ, মানুষ মহা পবিত্র ও ঐশ্বরিক।
- ❖ মানুষের জীবন হলো অতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত ও সংগ্রামবিধুর। সে দুনিয়াতে অস্তিত্বে এসেছে, আবার আরেকদিন প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী মারা যাবে

- মানুষজাতির আদি পিতা এডাম একটি ফল খেয়ে পাপ করেছিলেন। আর এ কারণে মানবজাতি গোড়া থেকেই একটি পাপের (Original Sin) বোঝা বহন করে বেড়াচ্ছে।
- একে তো বিশ্বজগৎ এমনিতেই অস্তিত্বে চলে এসেছে, আর মানুষও যেহেতু জানোয়ার গোছের পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে, তাই সে আর দশটা প্রাণীর থেকে বিশেষ কোনো মর্যাদা রাখে না।

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য

- একমাত্র প্রকৃত স্রষ্টার ইবাদাত করা ও দুনিয়ার বুকে একমাত্র স্রষ্টার ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটানো।
- ব্রহ্মা জগতে এক মায়ার সৃষ্টি করে রেখেছেন, আর এই মায়ার কারণেই মানুষ নিজের মাঝে সুপ্ত ঐশ্বরিকতাকে চিনতে পারে না, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে এ সুপ্ত ঐশ্বরিকতাকে যোগসাধনার মাধ্যমে বিকশিত করা এবং এভাবে যখন
- মানুষ নিজেকে চিনতে পারবে, তখনই সে মোক্ষলাভ করতে পারবে, তার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে।
- দুঃখ-ভারাক্রান্ত এ জীবনে মানুষের আসল উদ্দেশ্য হলো দুঃখ-কষ্টের আসল রহস্যের ভেদ করা। দুঃখ-কষ্টের আসল কারণ হলো নিজের প্রবৃত্তি ও মায়া। আর তাই জাগতিকতার মায়া ত্যাগ করে নিজেকে দুঃখ-কষ্টের এ চক্র (সংসার) থেকে পূর্ণ মুক্ত করে নিতে পারলেই হবে পূর্ণাঙ্গ মুক্তি, লাভ হবে “নির্বান”।
- স্রষ্টার উপাসনা করা, নিজের পাপময়তাকে চিনতে পারা এবং মানবজাতির পাপ মোচনের জন্য যে মহাদূত যীশু এসেছেন ও মানুষের পাপের বোঝার বহন করে নিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে চিনে নিতে ও ভালোবাসতে পারলেই, পরে মানুষের জন্য চিরন্তন মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে।
- মানুষের জীবনের আবার কী উদ্দেশ্য? সে হঠাৎ এসেছে প্রকৃতির নিয়মে। এমনিই একদিন উধাও হয়ে যাবে, তাই যত পারা যায় নিজের সুখ খুঁজতে হবে, যতটা পারা যায় নিজের ইন্দ্রিয়কে সুখী করতে হবে, জীবনকে খুব উপভোগ করতে হবে। এই জগতে এই তো মানুষের একমাত্র কাজ। সম্ভব হলে এর মাঝে মধ্যে অন্যকেও সুখী করার চেষ্টা করতে হবে।

নৈতিকতা বলতে কিছু আছে?	আত্মা বলতে কি কিছু আছে?
মানুষ এক নৈতিক সত্তা, স্রষ্টার পক্ষ থেকে নৈতিকতার উপলব্ধি তার মাঝে আছে। স্রষ্টা তাকে কিছু নৈতিক দায়িত্বও দিয়েছেন।	হ্যাঁ, আছে।
হ্যাঁ, আছে।	হ্যাঁ, আছে। তবে সেই আত্মা পরমাত্মার-ই একটি অংশ মাত্র।
অপরিবর্তনীয় নৈতিকতা বলতে কিছু নেই। তবে মানুষকে নিজের অহমবোধ ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে, অন্যথায়???	আত্মা বলতে কিছু নেই। 'শরীরের চেতনা আত্মার কারণে আসে কিংবা আত্মা মানে হলো অপরিবর্তনীয় ব্যক্তিক বোধ'- এ ধারণা ভুল। তবে মানুষের মাঝে এক ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তি আছে যা শারীরিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন।
হ্যাঁ, আছে।	হ্যাঁ, আছে।
না, মানুষের মাঝে নৈতিকতা বলতে কিছুই নেই। সবই আপেক্ষিক	আছে অথবা নেই। নিশ্চিত না। খুব সম্ভব নেই।

মৃত্যু হলে মানুষ কোথায় যায়?

- মৃত্যু এক অমোঘ বাস্তবতা। মৃত্যুর পরে মানুষের আখিরাত শুরু হয়ে যায়। আর একদিন সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ সবাইকে স্রষ্টার সামনে নিজের দায়িত্বের জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে।
- ভালো কর্ম করলে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, অন্যথায় নিম্নস্তরের কোনো পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। ঈশ্বরের সাথে পূর্ণ মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এ চক্র চলতেই থাকে।
- ভালো কর্ম করলে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, অন্যথায় নিম্নস্তরের কোনো পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। দুঃখ-কষ্টের সংসার থেকে দুঃখ-কষ্টের প্রকৃত কারণ না জেনে দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণ মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এ চক্র থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়।
- ভালো কাজ করলে মানুষ সদা প্রভুর সাথে চিরন্তন স্বর্গে বাস করবে, আর খারাপ কাজ করলে নরকে যাবে

❖ মৃত্যুর পরের জীবন বলতে কিছুই নেই। মানুষ মৃত্যুর সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় মহাকালের গর্ভে।

দ্বীন ইসলামের সারবস্তু

ইসলামে সেই 'দ্বীন' মানে হলো- আল্লাহ তাআলাকে সকল কিছুর ওপর কেন্দ্রীয় ক্ষমতাবান, নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য সত্তা মেনে নেওয়া। তাঁর পক্ষ থেকে আসা বিধিবিধান বা শরীয়ত অনুযায়ী আনুগত্যের কাঠামো সাজানো এবং গোটা জীবনকে সেই কাঠামো অনুযায়ী পরিচালন করা।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۗ﴿۲﴾
اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ
زُلْفٰى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۬ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ

আমি তোমার নিকট এই গ্রন্থ সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। জেনে রেখো! অবিমিশ্র আনুগত্য কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। (সূরা যুমার, ৩৯ : 2-6)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي غالٍ مِني فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دون الله وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
. وأن أهم وجهك اللتين حنيفاً ولا تكونن من المشركين

বলে দাও : হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দিহান হও তবে আমি সেই মা'বুদদের ইবাদাত করি না, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করো; কিন্তু আমি সেই আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, আর আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি। আর এটাও (আদেশ করা হয়েছে) যে, তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের প্রতি স্থির রাখো, আর কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে। (সূরা ইউনুস, ১০: ১০৪-১০৫)

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মের সারবস্তু হলো— ইবাদাত, নিরঙ্কুশ আনুগত্যের জন্য আল্লাহ তাআলাকে একক সত্তা হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁর ইবাদাতে ও কর্তৃত্বে কাউকে অংশীদার না করা এবং তাঁর বিধিবিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা। যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাওহীদের দিকে আহ্বান করার জন্য। মানুষ যেন ইবাদাত ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্তকারী সকল উপাস্যদের বর্জন করে চলে, সেই দাওয়াতই নবীগণ দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দাওয়াত নিয়ে এসেছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই

ওহী প্রেরণ ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত করো। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫)
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
আল্লাহর ইবাদাত ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ :৩৬)

অর্থাৎ, মানুষের আদি-পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল নবীই তাওহীদের বাণী প্রচার করেছেন। আজীবন মানুষকে এর দিকেই আহ্বান করে গেছেন। আর তাই যখন তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা/জড়বস্তু/ প্রাকৃতিক শক্তি/মানুষ/ধন-দৌলত বা অন্য কিছুকে আল্লাহর অধিকার দেওয়া হবে, তখনই তা হয়ে যাবে মৌলিক বা আদি দ্বীন থেকে বিচ্যুতি। তা হয়ে যাবে বদদ্বীনি বা অধর্ম। যুগে যুগেই তাওহীদ ও নির্দিষ্ট কিছু বিধিবিধান সম্বলি শরীয়ত দিয়েই আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে মানুষ নবীদের শিক্ষা থেকে দূরে সরে আসে। এভাবে নবীদের শিক্ষা- বিবর্জিত ও বিকৃত শিক্ষাকেই তারা একেকটা ধর্ম বানিয়ে নেয়। এভাবেই জন্ম নেয় অনেক অনেক ধর্মের।

وما كان الناس إلا أمة واحدة لما تختلفوا وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا .
আর সমস্ত মানুষ (প্রথমে) এক জাতি ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ করল... (সূরা ইউনুস, ১০ : ১৯)

علن الناس أُمه واجدا فبعث الله النبيين منيرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس
মানবজাতি একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদ- বাহক ও ভীতি প্রদর্শকরূপে নবীদের প্রেরণ করলেন এবং তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন, যাতে (ওই গ্রন্থ) তাদের মতভেদের বিষয়গুলো সম্বন্ধে মীমাংসা করে দেয়... (সূরা বাকারা, ২ : ২১৩)

সকল ধর্মই তো ভালো ভালো কথা বলে!

সকল ধমই সত্য কথা বলা, মিথ্যা না-বলা, হত্যা না করা, ধর্ষণ না-করা- সহ ভালো ভালো কথা বলে। তাহলে ধর্মে ধর্মে এত বিভেদ করে আসলে লাভটা কী? সব ধর্মের ভালো দিকটা নিয়ে সহনশীল সমাজ গঠন করলেইতো হয়! বিভেদ করা বা না-করা তো পরের কথা। আগে আমাদেরকে এ ধরনের প্রশ্নকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

প্রথমত, সত্য তো কেবল একটিই। সত্য একক। একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসমালাই (set of beliefs) কেবল সঠিক হতে পারে। ২+২ এর উত্তর কি ৩, ৪, ৫ যে-কোনোটিই হতে পারে? নাকি এর উত্তর স্রেফ ৪? সত্য যেহেতু কেবলমাত্র একটিই, তাই অনেকগুলো সত্যের সম্ভাবনাই বাতিল। সত্যের মাঝে বহুমাত্রিকতার স্থান নেই, তেমনই ধর্মের মাঝেও

বহুমাত্রিকতার স্থান নেই। যেকোনো একটি ধর্মই পূর্ণাঙ্গ সত্য হবে।

দ্বিতীয়ত, বাহ্যিক সাদৃশ্য ও আর পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্যের মাঝে আসমান-জমিন ফারাক আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকল ধর্মেই সত্য কথা বলা, মিথ্যা থেকে দূরে থাকা, ভালো কর্ম করা, হত্যা না-করা ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কথা বলা আছে, তা অনস্বীকার্য। তবে এতটুকু দেখেই যদি কেউ বলে দেয় এগুলো আসলে একই জিনিস, তবে এতে আপত্তি করতেই হয়।

কেননা এসকল নৈতিকতা বা নীতিশাস্ত্রই ধর্মের মৌলিক বিষয় নয়; বরং ধর্মের মৌলিক বিষয় হলো বিশ্বাস। নীতিশাস্ত্র (Morality) ও ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান (Rituals) মূলত ধর্ম যে-বিশ্বাস নির্ধারণ করে, তার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। তাই ধর্মীয় বিশ্বাসই হচ্ছে ধর্মের সারবস্তু। তাই ধর্মকে বিচার করতে গেলে নৈতিক নীতিমালার আগে ধর্মীয় বিশ্বাসকেই বিচার করতে হবে।

ধর্মসমুহের বৈপরীত্য

আর বিশ্বাসের কারণে উপরিউক্ত বাহ্যিক সাদৃশ্যের গভীরেও ব্যাপক বৈসাদৃশ্য দেখা দেয়। যেমন, সত্য বলতে আসলে কী বোঝায় এ বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে পার্থক্য আছে। কারণ, সত্যের ধারণা বিষয়েই ধর্মসমূহের মধ্যে মতভেদ আছে। ‘যে জিনিস যেমন, তাকে সেভাবেই বর্ণনা করাকে আমরা সত্যবাদিতা বললেও বিষয়টি কিন্তু এতটা সহজ নয়। যেমন ধরুন ‘মূর্তিপূজা করা ভালো' এ কথাটা সত্য নাকি মিথ্যা?

এর উত্তর একেকজন নিজ নিজ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সত্য অথবা মিথ্যা বলবে। মুসলিম বলবে : ‘এই কথাটা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।' হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনেক বড় একটি অংশই বলবে : ‘এটা অবশ্যই সত্য।' অন্যান্যরাও ভিন্ন ভিন্ন জবাব দেবে। কেন?

কারণ হলো 'বিশ্বাস'। তাহলে দেখা যাচ্ছে ‘সত্য কথা বলা' সাধারণ এ বিষয়টিতেও বেশ জটিল পথ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে সত্য কথা বলা মৌলিক সত্যের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। মহাবিশ্ব ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে মৌলিক সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া এবং সেই সত্য-সাক্ষ্যের পদানুসরণ করে জীবনের সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা হলেই ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ সত্যবাদী বলা যেতে পারে।

জীবহত্যার বিষয়টাতে এলে দেখা যায় ধর্মে ধর্মে ব্যাপক মতপার্থক্য। এক ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হলো—সকল জীবই ঈশ্বরের অংশ ও পরমাত্মার অংশ। তাই কোনোপ্রকার জীবকে হত্যা করা তো দূরে থাক, ক্ষতি করাও কঠোরভাবে নিষেধ। আরেক ধর্মে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ-কষ্টের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো কোনো জীবকে কষ্ট না দেওয়া, দুঃখ না দেওয়া। ফলে তাদের কাছেও জীবহত্যা মহাপাপ। কিন্তু ইসলামের বিশ্বাস হলো—

আল্লাহ মানুষকে ও সকল জীবজন্তুকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। জীবনধারণের জন্য আল্লাহ কিছু কিছু প্রাণী ভক্ষণ করাকে মানুষের জন্য বৈধ করেছেন।

কোনো কোনো ধর্মে মানুষ হত্যা করা কখনোই বৈধ নয়। কিন্তু ইসলামের অবস্থান এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের নিয়ম হলো—বিনা অপরাধে কোনো মানুষকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো অপরাধ করা হলে, অপরাধীর জন্য ইসলাম শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। কখনো কখনো সেই শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। এমনকি ইসলামের বিশ্বাস হলো—এসকল শাস্তির মধ্যেই আছে জীবন রক্ষার উপায়।

এক্ষেত্রে মৌলিক বিশ্বাসের ভিন্নতায় বাস্তবিকভাবে বিশাল পার্থক্য সূচিত হলো। এভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায়, এক ধর্মে যা মহাপাপ আরেক ধর্মে তা বৈধ। কখনো-বা তা করাটা আবশ্যক। এক ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে শিরক বা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা সবচেয়ে বড় পাপ। আবার আরেক ধর্মের প্রথম পাঠ শুরুই হয় শিরকের মাধ্যমে। এক ধর্মে জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক অংশই হলো ওহী বা স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা প্রত্যাদেশ। আবার আরেক ধর্মে জ্ঞানতত্ত্বের বয়ানে ওহীর নামগন্ধ পর্যন্তও নেই। এ কারণে কিছু কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ করা যাবে যে, সেখানেও কঠোর মতবিরোধ পাওয়া যাচ্ছে। তাই বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে সকল ধর্মের মাঝে ঐক্যের ডাক দিলেও বাস্তবিক অর্থে তা সম্ভব নয়।

ইসলাম-ই কি সত্য ধর্ম?

পৃথিবীতে অনেক ধর্ম, অনেক মতবাদ। তারা সকলেই দাবি করে একমাত্র তারাই হক। এত এত ধর্মের মাঝে 'একমাত্র' ইসলাম-ই সঠিক, ইসলামই সত্য? যদি তা-ই হয়, তবে ইসলাম কেন হক? কেন ইসলাম সত্য? ইসলামই যে একমাত্র সত্য, এটা কীভাবে বুঝব? আমরা ধাপে ধাপে এই আলোচনা নিয়ে আগাতে পারি। এর আগে আরও একটি গল্প বলে নিই। ছোটবেলায় আকবর ও বীরবলের একটি গল্প পড়েছিলাম। সেখানে আকবর ছোট একটি কাপড় দিয়ে তার সভার নবরত্নদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল যে, এতটুকু কাপড় দিয়ে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকতে হবে। কিন্তু কাপড় এমনই ছোট যে, মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যায়, আর পা ঢাকলে মাথা উদাম থাকে। আমরা ধর্ম-মতবাদ-সভ্যতা-সংস্কৃতির মাঝে যে বিতর্ক দেখতে পাই, তা অনেকটা এরকমই। জীবনের এক ক্ষেত্রে এক ধর্ম খুব লম্বাচওড়া আলোচনা করলে আরেক জায়গায় তার আনাগোনা পর্যন্ত থাকে না! আবার জীবনের সকল স্থানে অভিন্ন ও একক সত্যকে ব্যবহার করতে গেলেও আকবর-বীরবলের এই ঘটনার স্মরণ হয়। এ কারণেই আমরা সত্যের ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড ব্যবহার করব।

একে আমরা সূত্রও বলতে পারি। সত্য এমন হতে হবে, যা সর্বাধিক যুক্তিসংগত সমাধান পেশ করে। সেটাই সত্য, যা সাধারণ বুদ্ধি, ফিতরাত-মানবীয় স্বভাব, জীবনের নিত্য সত্য-সহ সকল মানবীয় বিভাগের (Human Faculties) দাবি ভারসাম্যপূর্ণভাবে পূরণ করে। সত্য তা-ই হবে, যার পক্ষে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং যা দ্বারা জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। সে সমাধান এমন হতে হবে, যার বিপক্ষে জ্ঞান বুদ্ধির অভিযোগ করার কোনো অবকাশ থাকে না। সেটা মেনে নিলে সমাধান অযোগ্য এমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না, যা অন্য কোনো পন্থায় দূরীভূত করা অসম্ভব। সে সমাধান এমন হবে, যার বিপক্ষে কোনো যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করানো যাবে না। সত্য এমন হতে হবে যা মহাবিশ্ব, মানুষ ও সৃষ্টিজগত সহ সকল স্থানেই প্রজোয্য। এদের সকলকে যেই সুতো দিয়ে একই মালায় গাঁথা যাবে, বোঝা যাবে সেটিই সত্য। কারণ সত্য সর্বব্যাপী, সর্ববিস্তৃত। তবে ইসলামের সত্যতা জানার আগে সংক্ষেপে ইসলামের পরিচয় জেনে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

এক নজরে ইসলাম

সহস্র বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে। লক্ষ পাখা অহর্নিশি ঘুরছে। অসংখ্য গাড়ি দ্রুত দৌড়াচ্ছে। শত শত কারখানা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। কিন্তু এগুলোতে কোন শক্তি কাজ করছে এবং সেই শক্তি কোথা থেকে আসে, তা জানার কোনো উপায়ই আমাদের জানা নেই। এসব কর্মকাণ্ড ও বাহ্যিক নিদর্শন দেখে লোকদের মন হতচকিত ও স্তম্ভিত। প্রত্যেক ব্যক্তিই এর কার্যকারণের সন্ধানে বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। কেউ বলছে—এ সবকিছুই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত এবং স্বীয় শক্তি বলে চলমান, গতিশীল। এগুলোর নিজস্ব সত্তার বাইরে এমন কোনো শক্তি নেই, যে এগুলোকে আলো বা গতি দান করতে পারে। কেউ বলছে—এসব জিনিস যেসব বস্তু থেকে সৃষ্ট, সেগুলোর সংযোজন ও সংগঠনই এদের মধ্যে আলো ও গতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। অন্য কারও মতে, এ বস্তুজগতের বাহিরে কতক দেবতা রয়েছে যাদের মধ্যে কেউ বাতি প্রজ্জ্বলিত করে, কেউ ট্রাম রেলগাড়ি চালায়, কেউ পাখাগুলোতে ঘূর্ণন। ও আবর্তন ঘটায় এবং কারখানা ও যন্ত্রের চাকাকে গতিশীল করে। অনেক লোক আবার এ বিষয়টি চিন্তা করতে করতে হতচকিত হয়ে মত দিয়ে বসেছে যে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও গভীর রহস্যাবৃত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। না। আমরা শুধু এতটুকু জানতে পারি যতটুকু নিজেদের চোখে দেখতে পাই। ও অনুভব করতে পারি। তার অধিক কিছু আমরা বুঝতে পারি না। আর যা আমাদের বোধগম্য নয়, আমরা তার সত্যতাও যেমন স্বীকার করতে পারি না, তেমনি পারি না একে মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে।

আল্লাহ তাআলাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক

অপরদিকে সামগ্রিক বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা। পৃথিবী নামক বিশাল এই কারখানা দেখলে বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি মোটেও সায় দেয় না যে, জটিল জটিল নিয়মসমৃদ্ধ এ গোটা পৃথিবীর উদ্ভব হওয়ার পেছনে কোনো সৃষ্টিকর্তার হাত নেই। বরং নীলাকাশ, প্রাণের অকল্পনীয় বৈচিত্র্য, এদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থাপনার জন্য অপূর্ব বাস্তুতন্ত্র (ecosystem), মানুষের অভূতপূর্ব শারীরিক ক্ষমতা, শরীরবৃত্তীয় যোগ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক উপযোগীতা সহ গোটা মহাবিশ্বের দিকে তাকালেই মনে হয়—এ পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। তিনিই এ জগতকে সৃষ্টি করেছেন। এসবকিছুর দিকে তাকিয়ে বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি-চেতনাকে নিরপেক্ষভাবে ছেড়ে দিলে তারা সম্মিলিতভাবে আপনা-আপনিই ঘোষণা করতে থাকে—হ্যাঁ, এ সকল কিছুই এক পরম সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। তিনিই এ গোটা জগতের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনিই পরম শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের উপযুক্ত সত্তা। কেননা সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এভাবেই তাঁকে জানার, বোঝার ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এককথায় মানুষকে একধরনের স্বাধীনতা দিয়ে দুনিয়ায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। মানুষকে এই প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করার সময়ই বিশ্বজগতের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে—আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারও অধীন নও। এবং আমি ছাড়া আর কারও বন্দেগি, দাসত্ব, উপাসনা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই।

মানুষ চারদিক পর্যবেক্ষণ করলে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাবে। সে এসকল নিদর্শন দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ করবে, তাঁর মহত্ত্বকে মনে করতে পারবে, সত্য-সঠিক পথের নির্দেশনা পাবে। যে ব্যক্তি কোনোদিনও ধর্মের বাণী শোনেনি, কুরআন পড়েনি, বেদের শ্লোক সম্পর্কে যে অজ্ঞ, খ্রিষ্টের সুসমাচারের নামও তার কানে আসেনি, কোনো ধর্মীয় গুরুর নিকটেও সে যায়নি—সেও আকাশ ও পৃথিবীর অজস্র নিদর্শন দেখে এক পরম ও মহানতম স্রষ্টার কথা চিন্তা করে। কেননা,

إلا في خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَالختلفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لايت لأولى الألي

আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৯০)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَءَايَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে, রাত-দিনের আবর্তনে, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে জলপথে চলমান নৌযানে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন তাতে, তিনি ভূমিতে যেসব পশু-প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতে, বাতাসের দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ আর ভূমির মাঝে ভাসমান মেঘরাশিতে অবশ্যই বুঝমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারা, ২: ১৬৪)

মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এটাই তার মৌলিক স্বভাব। পৃথিবীতে আসার সময়ই আল্লাহ তাআলা মানুষের চেতনাতে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর তাওহীদ, তাঁর বড়ত্বের চেতনা প্রোথিত করে দিয়েছেন। নিজের চাইতে বড় কোনো সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত হওয়া, তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা, তাঁকে ভালোবাসতে চাওয়া, তাঁকে চরম ভয় করা, কাউকে নিজের ভাগ্যবিধাতা বলে মনে করা, কারও প্রতি সম্মানে মাথা নুইয়ে দেওয়া, তাঁর উপাসনা করা—এসকল কিছু মূলত মানুষের মূলগত স্বভাব থেকে উদ্ভূত। এসবকিছু বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার অপরিপক্ক মগজের খেল নয়। এই অনুভূতি মানুষের মাঝে হাওয়া থেকেও ভেসে আসেনি। এহেন চেতনা মানুষের বুঝের দুর্বলতা নয়। বরং এটা মানব ইতিহাসের এক সার্বজনীন ঘটনা। পৃথিবীতে এমন কোনো যুগ নেই, এমন কোনো জমানা নেই, যেখানে মানুষ নিজের চাইতে বড় কোনো সত্তাকে পরম ভালোবাসা, নিবিড় মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও বিনয়মিশ্রিত ভয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়নি। এমন কোনো সভ্যতা পাওয়া যায় না, যেখানে কাউকে না কাউকে সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে নিজের ভাগ্যবিধাতা বলে মেনে নেওয়া হয়নি। কিন্তু এখানে এসেই মানুষ ভুল করে। নিজের স্বভাবকে খণ্ডিত করে বোঝার কিংবা নিজের স্বভাবের অপূর্ণাঙ্গ প্রকাশকেই সে পরিপূর্ণ বলে মনে করে।

পরম আনুগত্য কেবল স্রষ্টার অধিকার

এসকল কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র পরম স্রষ্টাই পেতে পারেন। একমাত্র তিনিই এর যোগ্য, অন্য কেউ নয়। কোনো বস্তু (matter), কোনো প্রকৃতি, কোনো দিব্যপুরুষ, বৃক্ষতলে বসে থাকা সাধক মহাশয়, সাধনায় লীন হয়ে যাওয়া কোনো দিগম্বর, মানবজাতির জন্য 'তথাকথিত' আত্মাহুতি দেওয়া বাদামি চুলের নর, মূর্তি-পুতুল-প্রতিমা, কোনো নবী-রাসূল-ওলী-বুজুর্গ, নিজের অহমবোধ, নিজের কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষা — কেউ নয়। অন্তরের আবেগ- মিশ্রিত

ভালোবাসা ও আকর্ষণ, অন্তরের গভীর থেকে উত্থিত হওয়া ভয়, পরম আনুগত্য, একনিষ্ঠ দাসত্ব, খালিস ইবাদাত (উপাসনা) কেবলমাত্র সেই পরম স্রষ্টাই পেতে পারেন, যিনি এ গোটা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ও সকল প্রাণই তাঁর পরিকল্পনার-ই ফসল, তাঁর-ই সৃষ্টি। ভালোবাসলে তাঁকেই বাসতে হবে, ভয় পেতে হলে তাঁকেই পেতে হবে, সাহায্য চাইতে হলে তাঁরই নিকট চাইতে হবে, ত্রাণ চাইতে হলে তাঁর দরবারেই হাত পেতে বসতে হবে, ভিক্ষা চাইলে তাঁর দরজায়ই উপনীত হতে হবে। বিপদ থেকে মুক্তি তিনিই দিতে পারেন, সকল কঠিনকে সহজ তিনিই করতে পারেন, তিনিই পারেন সকল সমস্যার সমাধান দিতে। তিনিই মানুষের অন্তরের সুপ্ত খবর জানেন।

এ কারণে পরম আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য, তাঁর ইবাদাত পৃথিবীর একমাত্র পরম সত্য। দাসত্ব পাওয়ার উপযুক্তও কেবল তিনিই, বিধান দেওয়ার উপযোগী কেবলমাত্র তিনিই। বৈধ-অবৈধ নির্ণয়ের দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই, সত্য ও ন্যায়ের পথ একমাত্র তিনিই দেখাতে পারেন। পূর্ণাঙ্গ সত্যের পথ একমাত্র তিনিই দেখ। ৩ পারেন, তিনিই সক্ষম হিদায়াত দিতে, ভালোবাসলে তাঁর জন্যই বাসতে হবে, ঘৃণা করলেও তাঁর জন্যই ঘৃণা করতে হবে। তিনিই আল্লাহ, তিনিই নিখিল ধরণীর প্রভু, তিনিই একমাত্র ইলাহ। এটাই ইসলামের মূল মর্মবাণী। একেই বলে তাওহীদ। তাওহীদই পরম সত্য, তিনিই পরম সত্য,আল হক।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَق

।এসব এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা পরম সত্য। (সূরা হাজ্জ, ৩২ : ৫) তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি আমাদের চেতনায় গেঁথে দিয়েছেন যে—তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তত্ত্বাবধানকারী। তিনিই একক ও নিরঙ্কুশ শাসক, তিনিই দাসত্ব পাবার একমাত্র যোগ্য। এই প্রতিশ্রুতি আমরা রুহের জগতে করেই এ পৃথিবীতে এসেছি। এটা এক নিঃশব্দ প্রতিশ্রুতি ও নীরব ওয়াদা, যা প্রত্যেকটি মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবে গেঁথে রয়েছে।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

আর যখন তোমার প্রভু আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বলেন, (এই বলে যে,) 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' তারা বলে, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭২) মানুষের ফিতরাতে আরও গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে–এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী আবাস নয়, এ দুনিয়া পরীক্ষার স্থান।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য যে, তোমাদেরকে পরখ করে দেখবেন, কে তোমাদের মধ্যে কাজে সেরা। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা মূলক, ৬৭ : ২) এ দুনিয়াতে মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছ। কিন্তু তা মোটেও নিরঙ্কুশ নয়। এটা পরীক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর নির্বাচন করার স্বাধীনতা, দেবার মতো। এ পরীক্ষা দিয়ে

একদিন মানুষকে সেই মহান রবের নিকট জবাবদিহিতার জন্য দাঁড়াতে হবে, গোটা জীবনের হিসাবনিকাশ দিতে হবে।

যে সেই জবাবদিহিতার মহা ভয়ানক দিনে পার হতে পারবে তাকে জান্নাত দেওয়া হবে। যে তা করতে ব্যর্থ হবে, তাকে দেওয়া হবে জাহান্নাম। সেদিন জান্নাত পাওয়াই হচ্ছে প্রকৃত সফলতা, আর সেদিন জাহান্নাম পাওয়াই হচ্ছে সত্যিকারের ব্যর্থতা।

فتن را شرح عن النار وأدخل الحملة قلة قال

তখন যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫)

এ মৌলিক সত্যই মানুষের অভ্যন্তরীণ বিবেক, যুক্তিবোধ, অনুভূতি, চেতনায় প্রোথিত (instill) করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে মানুষের গোটা অস্তিত্বই এ সত্যের প্রতিচ্ছবি। যখন মানুষ তাঁর প্রত্যেকটি সামর্থ্যকে (faculty) সাধারণ ও নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করবে, তখন তা মানুষের ভেতর গেঁথে থাকা সেই নীরব প্রতিশ্রুতিকে উদ্‌গত করবে।

সিরাতুল মুস্তাকীম

এ কারণে মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে স্রষ্টার দেওয়া সহজ, সরল ও সত্য পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম হচ্ছে—

তাওহীদকে স্বীকার করে নেওয়া

আল্লাহকে নিজের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রব, মালিক বলে মেনে নেওয়া; তাঁর নিকটই আশ্রয় চাওয়া, তাঁর ওপরই পরম ভরসা করা। ভালোবাসলে তাঁর খাতিরেই ভালোবাসা, ঘৃণা করলেও তাঁর খাতিরেই ঘৃণা করা। একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা, একমাত্র তাঁরই দাস হয়ে থাকা। তাঁকেই সর্বোচ্চ সত্তা বলে বিশ্বাস করা। তাঁকেই হাকীমে আলা, মুখতারে কুল বা পরম শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁর নিকট থেকে আসা বিধিবিধান, হালাল-হারামকেই নিজের ও অপর সকলের জন্য গোটা জীবনে পরম পালনীয় ও মাননীয় বলে স্বীকার করা। তাঁর সাথে শিরক বা অংশীদার স্থাপন না করা। কারণ শিরক সবচাইতে বড় গুনাহ, সর্বাপেক্ষা কঠিন পাপ, সবচাইতে বড় জুলুম।

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

| নিশ্চয়ই শিরক একটি মহা অন্যায়। (সূরা লুকমান, ৩১: ১৩) আল্লাহ এ গুনাহ ক্ষমা করেন না, যদি কেউ তাওবা না করে এ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার পাপ কিছুতেই ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। আর যে আল্লাহর সাথে (কোনো কিছুকে) শরীক করে, নিঃসন্দেহে সে এক সুবিশাল পাপ করে। (সূরা নিসা, ৪ : ৪৮)

আখিরাতের জবাবদিহিতা

ইহজগতকে চিরস্থায়ী এবং দুনিয়াকে ভালো-মন্দের পূর্ণ প্রতিফলের স্থান মনে না করা। বরং বিশ্বাস করতে হবে—এই জগৎ কেবলমাত্র পরীক্ষাস্থল, এখানে মানুষ এসেছে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। মানুষের পরীক্ষা হচ্ছে—কে নিজের আপাত স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ না ধরে, নিজেকে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেয় এবং কে নিজেকে স্বাধীন মনে করে আল্লাহ বাদে নিজের নফসকে কামনা-বাসনাসহকারে গাইরুল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। যে নিজেকে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত করে, তাওহীদের প্রতি ঈমান আনবে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর এই সন্তুষ্টিই তাঁকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দেবে। ফলে সে আল্লাহর অপার দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করার সম্মান লাভে ধন্য হবে। জীবনের এই পরীক্ষায় সে সফলভাবে পাশ করতে পারবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আখিরাতে জবাবদিহিতার প্রতি ঈমানের বদৌলতে আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়াতেও সুস্থ, নির্মল ও ইনসাফের জীবন লাভ করতে পারবে। অন্যদিকে যে ঈমান আনবে না, তাওহীদকে বাদ দিয়ে নিজেকে তাগুতের নিকট সমর্পণ করবে—এ কারণে সে জীবনের এই পরীক্ষায় ফেল করবে, আখিরাতে হবে সে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। নস্যাৎ হবে তার সকল আমল, বিনষ্ট হবে তার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা। চিরন্তন আযাব ও শাস্তির জন্য সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে। কখনোই সেখান থেকে বের হতে পারবে না।

ঈমানের দুটি মৌলিক দিক

ঈমান বিল্লাহ ও ঈমান বিল আখিরাত হলো ঈমানের মৌলিক দুটি অঙ্গ। তাওহীদ ও আখিরাত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত সত্য দ্বীনের প্রাণ সঞ্জীবনী বৃক্ষের দুটি মগডাল। তাওহীদ ও আখিরাত হলো সত্য, সনাতন, আদি এবং সিরাতুল মুস্তাকিমের দুটি চিরস্থায়ী মার্গ (milestone)। এ কারণে এ দুটির একটি থেকেও বিচ্যুত হওয়া অর্থ সত্য পথ থেকেই বিচ্যুত হওয়া। আল্লাহ বাদে নিজের নফস, সরকার, ফেরেশতা নবী-রাসূল, মুনি-ঋষি, বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু, মুহাম্মাদ-সহ অন্য যে-কারও জন্য আল্লাহর অধিকারনির্ধারণ করলে, তা চিরন্তন সত্য থেকে ছিটকে পড়ার কারণ হবে। তেমনি দুনিয়াকে প্রতিফলের জায়গা মনে করে আত্মার পুনর্জন্ম (transmigration of soul) মতবাদ বানিয়ে নেওয়া কিংবা দুনিয়াকে নিরর্থক ভেবে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে শিকেয় তুলে 'my body my rule' এর বোকার স্বর্গ বানিয়ে নেওয়াও সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ। তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসই হলো সত্যের একমাত্র রাস্তা। এছাড়া হাজারো রাস্তা, মত-পথ, আদর্শ থাকতে পারে, তবে তার

সবগুলোই নির্জলা মিথ্যা। কেননা তাতে তাওহীদ ও আখিরাত নেই। তাই সেটা আল্লাহর মনোনীত নয়। আখিরাতে মুক্তি কেবল সত্য দ্বীনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাওহীদ ও আখিরাত ছাড়া যেকোনো মিথ্যা মতবাদের চূড়ান্ত স্থান হলো জাহান্নাম। এটাই একমাত্র সত্য ও সরল রাস্তা, যা চলে গেছে আল্লাহর দিকে। চিরসত্য, চিরসুন্দর ও সুমহান সেই সত্তার দিকে। তাওহীদ ও আখিরাতের এ সত্য দ্বীনকেই বলা হয় ইসলাম, যার অর্থ আত্মসমর্পণ। ইসলাম অর্থ হলো—তাওহীদের সকল অংশের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিধিবিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করা।

মানবজাতিকে হিদায়াত দিয়েই প্রেরণ করা হয়েছে

মানুষের ফিতরাতের মাঝে এসকল বোধ প্রোথিত করে দেওয়ার পর, আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এই দুনিয়াতে তিনি সর্বপ্রথম প্রেরণ করেন আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে (আলাইহিমাস সালাম)। এ কারণে আদমকে বলা হয় 'আবুল বাশার' বা মানবজাতির আদিপিতা। আর পৃথিবীতে আসার পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সত্য-সঠিক পথের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দিয়ে নবী করেই পাঠিয়েছিলেন। তাই যারা বলতে চায়—মানবজাতির শুরুটা সন্দেহ- সংশয়, শিরক-কুফর এবং অজ্ঞতা-অন্ধকারের মাঝে, তারা আসলে সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ।

আল্লাহ সর্বপ্রথম মানুষকে হিদায়াত দিয়েই পাঠিয়েছিলেন, আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সঠিক জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ছিল। মানুষের প্রারম্ভ হিদায়াতের পূর্ণ আলোর মাঝে। যেখানে সন্দেহ-সংশয়, শিরক-কুফরের চোরাগলি ও আঁকাবাঁকা রাস্তা ছিল না। মানুষের প্রাথমিক এই বংশধরেরা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও আঁধারের মধ্যে সৃষ্ট হয়নি। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা সত্যকে জানতেন। জীবনব্যবস্থা ইসলামই তাদের দ্বীন ছিল। আর ইসলামই মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিন তাদেরকে জীবনবিধান দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের
থেকে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন, ধর্ম, জীবনব্যবস্থা।

إِنَّ الَّدِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَمُ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯)

গাফিলতির কারণে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়

সর্বপ্রথম মানুষ ও নবী আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সন্তানদের এই সত্য-সনাতন দ্বীনই জানিয়ে গিয়েছেন। এই দ্বীনের শিক্ষাই তিনি তাঁর পরবর্তী বংশধরদের দিয়ে গেছেন। আল্লাহর প্রতি সমর্পিত ও অনুগত থাকার ধর্মই তিনি প্রচার করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়। বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করতে থাকে। সত্যের বিষয়ে মতভেদ করে বসে তারা, উদাসীনতা ও গাফিলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে একসময় এই সঠিক জীবনপদ্ধতি খুইয়ে বসে।

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِايْتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত মতবিরোধ করেছে। যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে তাদের জানা উচিত, আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯)

শয়তানী কুমন্ত্রণা তাদেরকে গ্রাস করে বসে। পূর্বপুরুষের শেখানো সত্য দ্বীনের শিক্ষাকে তারা ছুড়ে ফেলে। তাদের মধ্যে সত্য ধর্মের চেতনা বিকৃত হয়ে যায়। তারা আসমান-জমিনের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে তাঁর শরীক করে বসে।

নবীদের মিশন

বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাঁদের আগমনের এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। তাঁরা সবাই একই দ্বীনের, তথা জীবন-পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই একই হিদায়াতের প্রতি অনুগত। তাঁদের প্রত্যেকের মিশন ছিল এক ও অভিন্ন,সেগুলো হলো :

১. তাওহীদের দাওয়াত

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাকে ওহীর মাধ্যমে একথা বলেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই; অতএব, তোমরা আমার ইবাদাত করো। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫)

২. তাগুতকে অস্বীকার

তাগুত বা মিথ্যা উপাসকদের উপাসনা থেকে বিরত থেকে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের ওপর স্থির থাকার দাওয়াত দেওয়া।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّٰغُوتُ

| আমি তো প্রত্যেক জাতির কাছেই এই দাওয়াত দিয়ে একজন রাসূল পাঠিয়েছি—তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো। (সূরা নাহল, ১৬:৪৮)

৩. অটল-অবিচল থাকা

আল্লাহ যে দ্বীন ও শরীয়ত দিয়েছেন তাঁর ওপর অটল-অবিচল থাকা। আল্লাহর দ্বীনকে যথার্থভাবে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহর 'পূর্ণাঙ্গ' শরীয়তের অনুসরণ করা ও অন্যদেরকে অনুসরণের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর 'পূর্ণাঙ্গ'' অনুগত বান্দা হবার পথ শিখিয়ে দেওয়া এবং এই দ্বীনের বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত না হতে দেওয়ার পরামর্শ দিতে থাকা। একেই বলা হয় দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা বা ইকামাতে দ্বীন। এটাও আম্বিয়াদের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে

فرع لمكم قبل الذين ما ولى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بوه الترهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

তিনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীনই বিধিবদ্ধ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি তোমার কাছে নাজিল করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকেও; এই বলে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কোরো না। (সূরা শুরা, ৪২:১৩)

৪. ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা

আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা নবীদের মিশন। নবী-রাসূলদেরকে দেওয়া হয়েছে কিতাব বা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দিক-নির্দেশনা। দেওয়া হয়েছে মিজান বা ন্যায়পরায়ণতার সুষ্ঠু মানদণ্ড, যা অজস্র ভারসাম্যহীনতার মধ্যে সরল-সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখিয়ে দেবে। তাঁদেরকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তা হলো পৃথিবীতে মানুষের আচরণ, ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবেও যেন ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একদিকে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর অধিকার, নিজের অধিকার এবং আল্লাহর সেসব বান্দাদের অধিকার সঠিকভাবে জানবে এবং ইনসাফের কথা আদায় করবে, যাত সাথে কোনো না কোনোভাবে তাকে জড়িত হতে হয়। অপরদিকে সামাজিক জীবনের বিধিবিধান এমন নীতিমালার ওপর নির্মাণ করতে হবে, যাতে করে সমাজে কোনো প্রকার জুলুম অবশিষ্ট না থাকে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনি দিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা পায়, সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগে সঠিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের সবাই যেন ইনসাফমতো যার যার অধিকার লাভ করে। অন্যকথায়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছিল নবী-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁরা গোটা মানব-সমাজে

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন যাতে ব্যক্তি এবং ব্যষ্টি উভয়েই পরস্পরের আত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক ও সাংঘর্ষিক হওয়ার পরিবর্তে সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

আমি স্পষ্ট নিদর্শন-সহ আমার রাসূলদেরকে পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড দিয়েছি, যাতে মানুষ ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৫)

নবী-রাসূলদের জ্ঞান আল্লাহ-প্রদত্ত

নবী-রাসূলগণ মুনি-ঋষি-সাধক-দার্শনিকদের মতো জ্ঞানের অপূর্ণাঙ্গ উৎস থেকে জ্ঞান বিলি করতেন না। তাঁদের কাছে ছিল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে উদ্ভাসিত পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। তাই তাঁদের জ্ঞানের উৎস (epistemology) ছিল নির্ভেজাল, খাঁটি ও বিশুদ্ধ। এ কারণে ঈমানের বিষয়াবলি নবী-রাসূলদের সংবাদের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরাই এ পৃথিবীতে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে সেতু। ‘ঈমান বিল্লাহ' ও 'ঈমান বিল আখিরাত' ঈমানের মূল দুটি শাখা হলেও তা মূলত ঈমান বির রিসালাতের বা রাসূলদের সত্য সংবাদের ওপরই নির্ভরশীল। আর তাই ঈমানের মৌলিক শাখা তিনটি—ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর 'পূর্ণাঙ্গ' তাওহীদের ওপর ঈমান, ঈমান বিল আখিরাত বা আখিরাতের প্রতি ঈমান এবং ঈমান বির রিসালাত বা রিসালাতের প্রতি ঈমান। ঈমানের মৌলিক দাবি হচ্ছে নবী-রাসূলদের যথাযথ অনুসরণ করা। বিকৃতির এ দুনিয়াতে তাঁদের যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমেই সরল-সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এ কারণে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর আনুগত্য, তাঁকে ভয় করে চলা ও তাঁর জবাবদিহিতার প্রতি সচেতন হয়ে চলার পাশাপাশি নিজেদের আনুগত্য করারও দাওয়াত দিতেন। প্রত্যেক নবী-রাসুলই বলেছিলেন,

فاتقوا الله وأطيعون

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (সূরা শুআরা, ২৬ : 126))

নবী-রাসূলদের চেষ্টা-সংগ্রাম

আল্লাহ তাআলা প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নীতি-নৈতিকতা ও সমাজ- নবী- সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, 1-রাসূলদের প্রত্যেকেই ছিলেন তার প্রতি অনুগত। তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দ্বীন ও হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানান। তাঁরা জং পড়ে যাওয়া ফিতরাতের পবিত্রতাকে তাঁদের বিশুদ্ধ দাওয়াতের মাধ্যমে জাগানোর চেষ্টা করতেন, মানুষের বুদ্ধি-বুঝের মর্মমূলে আঘাত করে করে নিজেদের সত্য দাওয়াত পেশ করতেন। যারা এ আহ্বান গ্রহণ করত, তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মাতে পরিণত করেন, যারা নিজেরা হন আল্লাহর ও তাঁর বিধিবিধানের প্রতি অনুগত, এর পাশাপাশি তাঁরা দুনিয়ায় আল্লাহর আত্মসমর্পণের ওপর ভিত্তি করে তাঁর আনুগত্য কায়েম করার, ইবাদাতের পরিবেশ তৈরি করার এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা হিদায়াতের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সব সময় দেখা গেছে—মানব গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মাতে মুসলিমার অঙ্গীভূত হয়, তাদের অনেকেই ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোনো কোনো উম্মাত আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার
মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে গোটা চেহারাই বিকৃত করে ফেলে। এভাবে বিকৃতির ধারা চলতে থাকে।

সর্বশেষ নবী

সবশেষে মহামহিম আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়া সাল্লাম)-কে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। অর্থাৎ, অন্যান্য নবীদের সাথে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৌলিক দায়িত্বের কোনো তফাত নেই। তবে কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি ছিল। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ সাধারণত একটি জাতিগোষ্ঠী, এলাকা, অঞ্চল, শহর, নগরের জন্য প্রেরিত হতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন গোটা মানবজাতির জনাই প্রেরিত। আল্লাহ বলছেন,

وما أسلاك إلا كافة لبناني امها واخيرا

আমি তো তোমাকে সব মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২৮)

সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বেকার নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মাতদেরকেও তিনি আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হিদায়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং এই দাওয়াত ও হিদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মাতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ, যারা পথভ্রষ্ট মানবজাতিকে তাদের হারানো উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করবে, তাদের ফিতরাতকে আল্লাহর হিদায়াত দিয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। নিজেদের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আল্লাহর হিদায়াত দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে তুলবে, যেন সত্যের সাক্ষ্য পূর্ণতা পায়। মানুষ সত্যকে চিনতে পারে। যারা একদিকে আল্লাহর হিদায়াতের ওপর নিজেদের জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে, অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য চেষ্টা-মুজাহাদা চালাবে। এই 'পূর্ণাঙ্গ' দাওয়াত ও হিদায়াতের কিতাবই হচ্ছে কুরআন কারীম।

ইসলামকে কেন সত্য ধর্ম বলে মানি?

এ দাবির ব্যাপারে এখন আমরা প্রমাণাদি পেশ আমরা জানব -কেন আমরা একমাত্র ইসলামকেই সত্য ধর্ম বলে মানি এবং কোন কারণে মানি?

কিছু কিছু প্রশ্ন, কিছুর উত্তর প্রাপ্তির আশা মানুষকে দীর্ঘদিন যাবৎ ঘুরাচ্ছে প্রশ্নগুলো অনেক পুরোনো। উত্তর পাওয়ার আশাটাও সেই একই রকম। কারণ, প্রাপ্ত তো করাই হয়। উত্তর পাওয়ার আশায়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপরেই নির্ভর করবে আপনার জীবনের কাজকারবার। প্রশ্নগুলো বেশি না। মানুষ কে?

মানুষের জীবনের লক্ষ্য কী?

কেন এই দুনিয়া ও মানুষের সৃষ্টি?

এই বিশ্বচরাচরে মানুষের প্রকৃত স্থানটা কী?

এই মৃত্যু আর জীবনের ধারাবাহিকতা কেন?

জীবন-মৃত্যুর এই চক্রে মানুষকে কেন ঘুরতে হচ্ছে? এই জীবনের পরে কী আছে? আসলেও কিছু আছে কি? এতকিছুর পেছনে কোনো শক্তি কাজ করছে কি না?

কোনো স্রষ্টা আসলেই আছে কি না?

এই কয়েকটাই প্রশ্ন। এগুলোই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে কিলবিল করে উঠেছে। তারা চেয়েছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে। স্বর্গ-মর্ত্য কিছুই বাদ রাখেনি এই উত্তর খুঁজতে যেয়ে। যেকোনো মতবাদের গোড়ায় যেয়ে দেখবেন, তারা অবশ্যই এই মৌলিক প্রশ্নের কিছু না কিছু জবাব দিয়ে রেখেছে। এসকল প্রশ্নের ব্যাপারে তাদের কাছে নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। একটি ধর্ম বা মতবাদ কখনোই এসকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সামনে আগাতে পারে না। কারণ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানুষের

চেষ্টা, মেহনত, ও জীবন-দর্শনের সুবিশাল ইমারতের অদৃশ্যমান ভিত। আকাশছোঁয়া বিশাল বৃক্ষের সুগভীরে প্রোথিত মস্ত শিকড়। তাই ইসলাম সত্য কি না, তা যাচাই করতে হলে লক্ষ করতে হবে, ইসলাম এসকল প্রশ্নের কী জবাব দেয়, আদৌ দেয় কি না? দিলে কী সেই জবাব? ইসলামের দেওয়া উত্তর আমাদের সূত্রের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ?

জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী? অনেকের ধারণা এই জীবন বুঝি কেবলই ছেলেখেলা। খেলা ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কিই-বা আছে! দুই দিনের এই দুনিয়ায় কী হবে এত ভেবে? যা সামনে আসে, সেভাবেই জীবনযাপন করে নাও! এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। কোনো মানদণ্ড নেই, কোনো সত্য-মিথ্যা নেই, কোনো ভালো-মন্দ নেই। কারণ দুনিয়া একটি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশাল অনস্তিত্বের মাঝে এক অনভিপ্রেত অস্তিত্ব। কারণ, এই দুনিয়া এক আশ্চর্য দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। It's just an accident and accident doesn't have any purpose. দুর্ঘটনার যেহেতু কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তাই একই কথা খাটে মানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও। তার জীবনেরও কোনো অর্থ নেই। সবকিছুই মিথ্যা।

কিন্তু এসব ছেলে ভোলানো কথা মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে না। পারেওনি। এই কথাগুলো বলে সে নিজেকে পরিপূর্ণ বুঝ দিতে পারে না। কেননা তার স্বভাবের তাড়না হলো—সে নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবে, সে তার উদ্দেশ্য মোতাবেক জীবনের কর্মপন্থা ঠিক করে নেবে। এতটুকু জ্ঞানপিপাসা মানুষের স্বভাবজাত। এই স্বভাবজাত তৃষ্ণা মানুষকে ছুটিয়েছে, ভুগিয়েছে। কখনো আশার আলো দেখিয়েছে, আবার কখনো উত্তরের শূন্যতায় মানুষকে আশাহত করেছে।

মানুষ আকাশ ও পৃথিবীর বিশালতা দেখে অবাক হয়ে পড়ে। এদের মাঝে থাকা কল্পনাতীত শৃঙ্খলা দেখে হতবিহ্বল হয়ে যায়। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অজস্র প্রাণ, এদের বৈচিত্র্য, এদের মাঝে অভূতপূর্ব সংযুক্তি ও সামঞ্জস্য দেখে সে মূঢ় হয়ে পড়ে। কিন্তু এর পেছনের কারণ সে বুঝতে পারে না।

এর পেছনে কার্যকর শক্তিকে সে চিহ্নিত করতে পারে না। আপাত কাউকে কাউকে প্ররোচিত করেছে গোটা জগতকে 'অনর্থক' বলে দেওয়ার মতো দুঃসাহসিক উক্তি করতে।

মহাশক্তিধর স্রষ্টা

কিন্তু আসলেই কি তাই? একটি বিশাল কারখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কি বলতে পারে যে, এই কারখানা অনর্থক? লাইটের আলো, ঘূর্ণায়মান ফ্যান, শব্দ করে

চলমান অসংখ্য মেশিন এগুলো সব অনর্থক? এগুলো এমনি এমনিই চলছে কোনো দিক-নির্দেশনা ছাড়াই? এর পেছনে কোনো চালিকাশক্তি নেই? কেউ একে চালাচ্ছে না? কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ কি এগুলো বলতে পারে? মানুষের সুস্থ বিবেক ও সাধারণ বোধ-বুদ্ধি কি এহেন উক্তিকে আদৌ সমর্থন করতে পারে? মোটেও না। পৃথিবীর সকল শৈল্পিক কর্ম দেখে যখন এর শিল্পীর কথা স্মরণ হয়, তখন আকাশ পৃথিবী ও এর মাঝে এত কল্পনাতীত রহস্য দেখে কি এর পরিচালন-শক্তিকে মনে পড়ে না? এত এত বিশাল সৃষ্টিকর্ম কি এর শিল্পীর দিকেই ইঙ্গিত করে না? শিল্পীকে না-দেখা বা তাঁকে অনুভব না করতে পারার অর্থ তো এটা নয় যে, শিল্পী নেই। তাই না? মহাবিশ্বের কল্পনাতীত বিন্যাস ও এর পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো শক্তি আছে। এটা দুর্বল মানুষের অভ্যন্তরীণ গঠন এমনই যে, সুশৃঙ্খলতায় সে ভাবতে বাধ্য হবে যে, পরিকল্পনা আছে। এর নেপথ্যে অবশ্যই মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের প্রলাপ নয়। বরং এটাই মানুষের স্বভাব। এরকমটাই তার ধর্ম। পদার্থবিজ্ঞানী এ্যালবার্ট আইনস্টাইন পরিষ্কার স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন :

একজন ছোট বাচ্চা প্রকাণ্ড এক লাইব্রেরিতে প্রবেশ করছে, আমাদের অবস্থা ঠিক এরকমই—যেই লাইব্রেরির দেয়ালে সাজানো আছে সারি- সারি বই। নানান ভাষার বই। বাচ্চাটি এতসব দেখে এতটুকু বুঝতে পারে যে, কেউ না কেউ অবশ্যই এই বইগুলো লিখেছে। কিন্তু সে কে, তা ও জানে না। কীভাবে এত কিছু লেখা হলো, তাও তার অজানা। এত বইয়ের ভাষাও বাচ্চাটি জানে না। তবে সে অবশ্যই জানে, বইগুলোর বিন্যাসের পেছনে অবশ্যই কোনো পরিকল্পনা আছে। আছে রহস্যাবৃত এক শৃঙ্খল। (সূত্র : In Good Faith : Questioning Religion and Atheism, Scott A. Shay),এমনকি বিখ্যাত নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংও এমনটাই বলেছেন :

এই মহাবিশ্বে সুশৃঙ্খলার ছাপ অবাক করার মতো। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যতই আবিষ্কার করি ততই খুঁজে পাই যে, এটি যৌক্তিক নিয়ম। দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কেউ চাইলেই বলতে পারে যে, এই সুশৃঙ্খলতা স্রষ্টার কাজ। (হোমো স্যাপিয়েন্স : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি, ডা.রাফান আহমেদ)

আর প্রত্যেক স্রষ্টাই তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে থাকেন। তেমনি ও জগতের মাঝেও এক অদ্ভূত ঐক্য দেখে মনে হয় এ জগৎ যেমন এর স্রষ্টার মহাশক্তির পরিচায়ক, তেমনই তিনি এ সকল কিছুর মাঝে এক উদ্দেশ্য রেখে দিয়েছেন। চারপাশে বিস্তৃত এ মহা কারখানার মাঝে তিনি একটি গুপ্ত বার্তা (Hidden Message) রেখে দিয়েছেন। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটালে সেই গুপ্ত বার্তার কিছুটা আঁচ যায়। তা হলো আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা একজনই। তিনিই নিজ শক্তিবলে গোটা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তেমনি এ গোটা সৃষ্টিজগতের একটি

উদ্দেশ্য আছে। মানুষেরও উদ্দেশ্য আছে। মানবীয় সাধারণ কর্মশক্তি ও সামর্থ্যসমূহ সঠিক, সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে কাজে লাগালে এমন সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়।

এরপরও কীভাবে বলা যেতে পারে এগুলো নিরর্থক? এতকিছুর পরেও কি বলা যায় মানুষের জীবন অনর্থক? মানুষের সুনিপুণ গঠন, প্রত্যেকটি অঙ্গের মাঝে যথাযথ ভারসাম্য, মানুষের বোঝার শক্তি, স্মৃতিশক্তি, কোষ-সেল-ডিএনএ- এন্টিবডি ও এদের মাঝে শৃঙ্খলিত কার্যসমষ্টি দেখে কি কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলোকে অনর্থক বলে প্রতীয়মান হয়? এত চমৎকার ডিজাইন দেখে কি এর ডিজাইনারের কথা মনে পড়ে না? এত কার্যকরণের পর্যায়ক্রমিক প্রবাহ দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কি মনে হয় না, এগুলো একটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে?

স্রষ্টার পূর্ণাঙ্গ ধারণা

স্রষ্টাকে নিয়ে হাজারো মত-পথ আর চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। এতকিছুর মধ্য থেকে আসলে কোনটি রেখে যে কোনটি বেছে নেওয়া হবে, তা আসলেই মুশকিল বিষয়। কেউ স্রষ্টাকে বানিয়েছে First Cause বা প্রথম কারণ। কারও কাছে স্রষ্টা হলেন স্রেফ এমন একজন, যিনি পৃথিবীর গতির জন্য ট্রিগার চেপে দিয়েছেন মাত্র। এছাড়া তাঁর আর কোনো কৃতিত্ব নেই, যাকে কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন Prime Mover বা প্রধান গতিবিধায়ক। কারও কাছে স্রষ্টা কেবল প্রথম চেতন বা বুদ্ধিমত্তা, যার পোশাকি নাম First Intellect বা Nous। কারও কাছে স্রষ্টা নির্গুণ আবার কারও কাছে স্রষ্টা গুণসমৃদ্ধ। কারও কাছে স্রষ্টা অনেক বা কমপক্ষে স্রষ্টা কেন্দ্রে থেকে বিভিন্নজনকে দায়িত্ব বিভক্ত করে দিয়েছেন। আর তিনি আরামসে অবস্থান করছেন কোনো এক জায়গায় কার কাছে এই বাহ্যিক প্রকৃতিই এটা কারও কাছে যীশুই হলেন বই যীশু, আবার সেই ঈশ্বরই হলেন পবিত্র আত্মা। আস স্পিনোজার pantheistic God নাকি তিনি Personal "God? কোনটা? এত এত স্রষ্টার মাঝে আসল শ্রষ্টা কোনজন?

স্রষ্টার পরিচয়

اللهُ لا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে, সবই তাঁরা কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে

সুপারিশ করবে? যা কিছু মানুষের সামনে আছে, তা তিনি জানেন। এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে, সে সম্পর্কে তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা। (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৫)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

মূসা জবাব দিল, 'আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন।' (সূরা ত্বা 20: 50)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إلا
في كتاب مبني

তারই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে - যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেনা তার অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকার প্রদেশে এমন একটি শস্যকণাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত ননা শুষ্ক ও আ সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে। (সূরা আনআম, ৬: ৫৯)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُونَ لَهُ كُفُواً أحده

বলো : তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনিও কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (সূরা ইখলাস, ১১২ : ১-৪)

স্রষ্টা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম একটি কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে, নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে দিয়েছে একটি চিরস্থায়ী মানদণ্ড। বিশ্বকে দেখার জন্য একটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ লেন্স দিয়েছে। তাঁর ওপরই গোটা জীবনব্যবস্থা সাজানো হয়েছে। সেই জীবনদর্শন হলো, প্রতিটি বস্তুরই সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হলেন অংশীদার ও শরীকমুক্ত এক আল্লাহ। যিনি একচ্ছত্র ও একক, যাঁর কোনো শরীক নেই—না সৃষ্টিতে না অধিকারে। তিনিই মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের নিয়ন্ত্রক। যার দেওয়া বিধান অনুযায়ীই আসমান-জমিন চলছে। এককথায় ইসলাম সবকিছুর কেন্দ্রেই আল্লাহকে রাখে। তিনি সকল কিছুর মূলে আছেন। তিনিই যাবতীয় জিনিস এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি কেবল Prime Mover-ই নন, তিনি পরিকল্পনাকারীও। তিনি সৃষ্টির প্রথম ট্রিগার চেপে দিয়ে সুপ্ত হয়ে যাননি; বরং তাঁর পরিকল্পনাতেই গোটা সৃষ্টি অস্তিত্বে এসেছে।

না সৃষ্টির প্রথম ট্রিগার অন্য কেউ চেপেছে, আর না সৃষ্টির ট্রিগার চাপার পর তা আপনা-আপনিই হয়ে পাছে। বরং সকল কিছুই তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। তিনি রব ও পালনকর্তাও। তিনি কেবলমাত্র মহাবিশ্বের গতিবিধায়কই নন; এর নিয়ন্ত্রকও বটে। তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন, আবার তিনিই গোটা সৃষ্টির খবর জানেন, প্রতি মুহূর্তের এককভাবে গোটা জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি। খবর তাঁর কাছে আছে। তিনি তাঁর সৃষ্টির আগাগোড়া সবটুকুই জানেন। তিনিই এবং প্রতিটি সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত পরিমাণ রেখে দিয়েছেন, তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। তিনি কেবল প্রথম কারণই নন; বরং তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই সবকিছুর অধিকারী। তাঁরই হাতে সকল ক্ষমতা। রাতকে দিনের মাঝে। প্রবেশ তিনিই করান, আবার দিনকে রাতের মাঝ থেকে তিনিই বের করে আনেন। মৃত থেকে জীবন্ত করা, আবার জীবন্ত থেকে নিথর লাশ করা তাঁরই শক্তির আওতায়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর দাসানুদাস সকল কিছুই, ফেরেশতা, জিন ও মানুষ-সহ সকল স্রষ্টিই।

তিনি কেবলমাত্র impersonal কোনো সত্তা নন; বরং তিনি personal-s ফটো তিনি দূরবর্তী কোনো স্রষ্টা নন যাঁকে জানা যায় না, যিনি তাঁর সৃষ্টির কাছে অজ্ঞাত কোনো সত্তাও নন, তাঁর সৃষ্টি তাকে অনুধাবন করতে পারে যদি সে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও অনুধাবনশক্তি প্রয়োগ করে, তাঁকে জানাও সম্ভব যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে জানিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ভাগ্য-নির্ধারক। সৃষ্টির প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করেন, তাঁর সৃষ্টির আহ্বানে সাড়া দেন, সৃষ্টির সীমালঙ্ঘনকে তিনি ক্ষমা করেন। তিনিই ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা। তিনিই পরম ভয়, গভীর ভালোবাসার মতো যোগ্য। তিনিই মানুষের নির্ভরতা পাওয়ার একমাত্র উপযোগী সত্তা। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি আইন দেওয়ার যোগ্য। তিনিই একমাত্র পরম সার্বভৌমত্বের মালিক। একমাত্র পরম স্বাধীন সত্তা কেবল তিনিই।

তাওহীদ মানে শুধুমাত্র আল্লাহকে একক বলে স্বীকার করে নেওয়া নয়, আল্লাহ অবশ্যই লা-শারীক। কিন্তু এই লা-শারীক ইলাহের ধারণাকে মানুষ কীভাবে বাস্তবায়ন করবে, এটাই তাওহিদের মূলকথা। আল্লাহ বা স্রষ্টার যে ধারণা (Concept) ইসলাম দিয়েছে, তা নিতান্তই সোজা-সরল। অন্যদিকে তা অত্যন্ত গভীর এবং অতীব পূর্ণাঙ্গ। দ্বীন ইসলাম স্রষ্টার এমন এক ধারণা দিতে পেরেছে, যাতে যুগের পর যুগ অপূর্ণাঙ্গ ও আধা-সত্য দূর হয়ে গেছে। আরেকদিক থেকে সময়ে সময়ে স্রষ্টার ধারণার সাথে যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস যুক্ত হয়েছিল, তাও দূর হয়ে গেছে এবং মানুষ তাদের রবের পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়েছে। যিনি একইসাথে স্রষ্টা এবং পালনকর্তা। যাঁর উপাসনা করা যায়, ভালোবাসা যায়, না পাওয়া যায়। তাঁর নিকট থেকে দয়া ও রহমতের আশা করা যায়, আবার একইসাথে প্রচণ্ড শাস্তির আশঙ্কাও থাকে। পরমভাবে তাঁর ওপর নির্ভর করা যায়, আবার একমাত্র তাঁরই আইন মানা যায়।

মানুষকে দেয় সঠিক মর্যাদা

মানুষ কে? মানুষের পরিচয়ই-বা কী? মানুষ কি আর দশটা জীবের থেকে আলাদা কিছু? দুনিয়া কী? কেন? বস্তুবাদীরা যেহেতু পৃথিবীকে দুর্ঘটনাপ্রসূত বলে থাকে, তাই তাদের মানুষ আর দশটা প্রাণীর মতোই। সে শিম্পাঞ্জি জাতীয় কিছু একটা থেকে বিবর্তিত হয়ে এই পর্যায়ে এসেছে। সে আসলে এক ধরনের জানোয়ারই। হ্যাঁ, জানোয়ার থেকে একটু উন্নতও বটে। কিন্তু মানুষ পারে না জীবনের এত বৈচিত্র্যকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে। পারে না নিজের শরীরের মেকানিজম পুরোপুরি উপলব্ধি করতে। সে জানে না—এই বুঝশক্তি, চেতনা কোথা থেকে এল? এল তো এল, কিন্তু কেন এল? অন্য সবার তো বিবেক-চেতনা এগুলো নেই, তাহলে মানুষের কেনই-বা আছে? কী দরকার ছিল এই চেতনার? এতকিছুর বোঝার শক্তির প্রয়োজন কী ছিল? কিন্তু শিম্পাঞ্জির তো এই চেতনা-চেতনার বালাই নেই। তাহলে বিবর্তনের কোন পর্যায়ে এই চেতনা মানুষের পিছু নিল? কেনই-বা নিল? আর কেই-বা দিল এই চেতনা মানুষের মাঝে? এই চেতনার কাজ কী? বিশাল পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান কোথায়? এত এত মানুষের এই পৃথিবীতে অবস্থান কী? মানুষের মর্যাদা এই পৃথিবীতে কেমন? বস্তুবাদীরা ঘুরে ফিরে কিছু বাচ্চাভোলানো জবাব দিয়ে কুপ্রবৃত্তি আর খাহেশাতে মত্ত থাকতে চায়। কেননা এইসব প্রশ্ন নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলেই বুঝি কি-না কি বের হয়ে আসে।

আরে ধুর! কি বুঝো তুমি, হ্যাঁ? মানুষের মতো এত চমৎকার সৃষ্টি কোনোমতেই জানোয়ার গোছের কিছু হতেই পারে না। নিশ্চয়ই মানুষ অতীব পবিত্র এক সত্তা। আসলে মানুষ হচ্ছে ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি, পরমাত্মার এক অংশ, জীবাত্মা। তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া।

আল্লাহর খলিফা

আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন মানুষ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক অংশ মোটেও নয়। কিন্তু এর মানে মানুষ ফেলনা আর ছেঁড়া কাঁথার মতো মূল্যহীন, আর জানোয়ার গোছের কিছু তো অবশ্যই নয়; বরং মানুষ পৃথিবীতে তার পক্ষ থেকে পাঠানো প্রতিনিধি। এটাই হচ্ছে মানুষের এই দুনিয়াতে প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা। সে একটি মহান উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে এসেছে। এই উদ্দেশ্য হলে স্রষ্টার প্রতিনিধি হওয়া, সেই পরম স্রষ্টা আল্লাহর ইবাদাত করা ও সংসারকে সত্য, ন্যায়, উত্তম দিয়ে বিনির্মাণ করা। সত্যকে ধারণ করা, যাতে সত্য জয়যুক্ত হয়। মিথ্যার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করা, যাতে মিথ্যা পরাজিত হয়। আর সত্যের সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে যায় ও মিথ্যার জারিজুরি বন্ধ হয়। এই উদ্দ্যেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অপার সম্ভাবনাময় করে। নানা রহস্যের ভান্ডার করে। এই প্রতিটি সম্ভাবনা আর রহস্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেওয়া। যাতে করে মানুষ সেই খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

আবার সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন : আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা/প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাই। (সূরা বাকারা : ৩০)

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

কিন্তু আমি তো মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাত হানি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়িয়ে দেয় এবং সে দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়। (সূরা আম্বিয়া : ১৭)

ইহকাল ও পরকালের উপযুক্ত সমন্বয়

দুনিয়া নিয়ে চিন্তাবিদদের চিন্তার শেষ নাই। সাথে আখিরাত নিয়ে চিন্তা করার মতো লোকেরও অভাব নাই। কেউ কেউ দুনিয়াকে ঘাড়ে চেপে বসা মহা এক বিপদ মনে করে। এর থেকে ছুটকারা পাওয়ার জন্যে সকল চিন্তা ভাবনাতে ব্যয় ও ক্ষয় করেছে। এই দুনিয়ার দুঃখ, জরাজীর্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়া

পরে এই দলের চিন্তাভাবনার অন্ত নেই। কেন সুখ, কেন সুখে, কেন ব্যথা, কেন এ মানুষের জীবনে এসব নিয়ে এই চিন্তাবিদদের সনিয়ার এই সুখ-ঃখ, জরা-জীর্ণ, কৈশোর-যৌবন-বাক্যের চক্রের ব্যাখ্যা একেকজন একেকভাবে করেছে। সেই একেক চিন্তার ফসল ব্যাজের মাতার নাম অসংখ্য দর্শন। কিন্তু কেউই দুনিয়ার আসল জানতে পারেনি।

ইসলামের মধ্যমপন্থা

ইসলাম দুনিয়াকে স্রেফ ঝামেলা মনে করে একে তালাক দিয়ে দেয়নি। আর না অক্ষের মতো দুনিয়ায় ডুব দিয়ে থাকতে বলেছে। বরং দুনিয়া থেকে এর প্রয়োজনীয়টুকু হাসিল করে বাকি অংশকে ছেড়ে দিয়ে আসল কাজে মগ্ন থাকা, এটাই হলো সত্য দ্বীন ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের এ চিরন্তন ভারসাম্যপূর্ণ কথাটিই একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছিলেন কারুন নামের এক দুনিয়াপূজারীকে।

وابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ

আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরি করার কথা চিন্তা করো এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ নিতে ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন... (সূরা কাসাস ২৮ : ৭৭)

ইসলাম সব সময়ই আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। কারণ, ইসলাম বলে দুনিয়াতে ভোগ থাকলেও তা চিরস্থায়ী নয়। তাই এর পেছনে মাত্রাতিরিক্ত কামনার ঘোড়া ছুটিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। পৃথিবীতে দুঃখ অবশ্যই আছে। মানুষের জন্মই দুঃখ-কষ্টের মাঝে। তার বেড়ে ওঠা মেহনত আর পরিশ্রমের মাঝেই। তাই বলে এ দুঃখ যে তার

আজীবনের সঙ্গী তাও নয়; বরং ঈমান ও আমল তার সঙ্গী হলে শীঘ্রই তাঁকে প্রবেশ করানো হবে দুনিয়ার ‘দারুল কারার' থেকে 'দারুল খুলদ' এর অনন্ত সুখের স্থানে। আর যে ঈমান ও আমলের পথে চলবে না, তার বালিশ যদি সোনার তৈরিও হয় তবুও সে শীঘ্রই প্রবেশ করবে চিরস্থায়ী শাস্তির স্থানে, জাহান্নামের লেলিহান আগুনের মাঝে। ইসলাম এভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ির মাঝখানে এক ভারসাম্যপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করে। ইসলামে দাখিল হয়ে মানুষ জীবনকে সত্যিকার T-সহকারে যাপন করতে পারবে, আবার সচেতনভাবে নিজের
জীবনের মনজিলের দিকে অগ্রসর হতে পারবে।

ইসলামি বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত

অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন আমরা দেখতে পাই। অন্ধবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে হাজার হাজার দেবতা, তাদের মাঝের দ্বন্দ্ব- কলহ-সংঘর্ষ আর আজগুবি, বানোয়াট আর কাল্পনিক কাহিনির পুরাকথাকেই মীমাংসা, বেদান্তের দর্শনে প্রকৃতি-পুরুষ, আধ্যাত্মিকতা-বস্তুর মাঝে সম্পর্ক (Mythology) ধর্মের ভিত্তি বানানো হয়েছে। আবার কোথাও সংখ্যা, ন্যায়, নির্ণয় করতে করতেই দিন কেটে গেছে। ধর্মের আগা বা গোড়া কোনোটাই পাওয়া হয়ে ওঠেনি। কেউ কেউ যুক্তি আবার অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) চূড়ান্ত সীমা ঘোষণা করে চুপসে গেছে। আবার কেউ কেউ যুক্তি-অভিজ্ঞতা-বুদ্ধিকে শিকেয় তুলে দেশাচার আর লোকাচারের ফাঁদে পড়ে কুসংস্কারের বালুতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। কোথাও সাধনা-মেডিটেশান- ধ্যান-রিয়াযত ছাড়া ধর্মের সীমাতেই প্রবেশ করা যায় না। আবার কোথাও সাধনা-ফাধনা বাদ দিয়ে বাস্তবিক বা উপযোগবাদী দর্শন অনুযায়ী

ওহীর সাহায্যে ফিতরাতকে জাগ্রত করা

ইসলামও অন্যান্য ধর্মের মতো বিশ্বাস করতে বলে, কিন্তু সেই বিশ্বাস মোটেও অন্ধবিশ্বাসপূর্ণ নয়। বরং ইসলামের জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষকে খালি স্লেটের (Tabula Rasa) মতো করে সৃষ্টি করেননি; বরং তিনি মানুষকে ডিফল্ট (Default) একটি সিস্টেম দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। একে ফিতরাত বলা হয়। এ ফিতরাতের মাঝেই আল্লাহ তাআলা তাঁর অস্তিত্ব, তাওহীদ-এককত্ববাদ, তাঁর বড়ত্ব, নিজের চাইতে মহত্তর–উচ্চ কাউকে শ্রদ্ধা ও উপাসনা (Venerate) করার প্রবণতা, মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতার প্যাকেজ দিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা বাহ্যিকভাবে মানুষকে পর্যবেক্ষণ, ঘ্রাণ, শ্রবণ ইন্দ্রিয়গত শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ চান— এসকল মাধ্যম ব্যবহার করে মানবজাতি যেন তাঁর পরিচয় লাভ করতে পারে। এর উপায় হচ্ছে, সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ

করে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি দিয়ে তাকে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। তখন হবে নিরপেক্ষ জ্ঞান। এ ধরনের নিরপেক্ষ জ্ঞান ফিতরাতের দিকেই পরিচালিত করবে। যেহেতু ফিতরাত এবং এসকল ইন্দ্রিয়শক্তি ও যুক্তি-বুদ্ধি আল্লাহরই সৃষ্টি, তাই এগুলোর স্বাভাবিক ও নিরপেক্ষ ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই ফিতরাতের অনুগামী হবে। এগুলোর সঠিক ব্যবহার সব সময় ফিতরাতের দিকেই প্রবাহিত হয়ে থাকে। তবে এগুলো কখনো কখনো বাহ্যিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে সুপ্তাবস্থায় থাকে। কখনো কখনো এদের স্বাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ হয়ে পড়ে, এদের ব্যবহারের পথ ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়।

মানুষের ইন্দ্রিয়গত শক্তি থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ পূর্ণাঙ্গ হয় না। কখনো সে অপূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পাওয়ার বিভ্রমে পতিত হয়, আবার কখনো কখনো সে কুযুক্তির খপ্পরে পথ হারায়। এর ফলে তা ফিতরাতের অনুগামী হতে পারে না। তখন ইন্দ্রিয়শক্তি দিশেহারা হয়ে যায়, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়, আর ফিতরাত নিঃসঙ্গ হয়ে যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবীদের মাধ্যমে মানুষের হিদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন। নবীদের নিকট ওহী প্রেরণ করে সকল সত্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এবং তাঁদেরকে মানুষের হিদায়াতের জন্য কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

ওহী মানুষের বিবেক বুদ্ধির ভুলভ্রান্তিকে ত্রুটিমুক্ত করে দেয়—ভুলের সংশোধন করে, ভুল করা থেকে রক্ষা করে। ইন্দ্রিয়জনিত বিভ্রান্তি রহিত করে দেয় এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে এমন এক স্থানে পৌঁছে দেয়, যেখান পর্যন্ত পৌঁছা তার পক্ষে নিজস্ব শক্তিবলে কখনো সম্ভবপর হতে পারে না। এছাড়া মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক যে ব্যাপারে কখনো ঐক্যমতে পৌঁছতে পারে না, পারস্পরিক মতদ্বৈধতার সংঘর্ষে পড়ে বিপর্যস্ত হয়, ওহী সেখানে সব বিরোধ দূর করে দিয়ে চূড়ান্ত মতৈক্যে পৌঁছায়। (আল- কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ)

নবী-রাসূলগণ মানুষকে আজীবন সত্যের দিকেই ডেকে গেছেন। মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা জারি রেখেছেন, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দ্বারা সন্দেহ দূর করার প্রচেষ্টা করেছেন। এসকল কিছুর মাধ্যমে মানুষের ফিতরাতকে সুপ্তাবস্থা থেকে জাগ্রত করার মেহনত করে গেছেন, যাতে করে দুনিয়ায় সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তাঁর নিদর্শনকে খুলে খুলে বয়ান করেছেন, স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কখনো প্রশ্ন করেছেন যাতে করে মানুষ অচৈতন্য থেকে চেতনার দিকে ফিরে আসতে পারে, কখনো তিরস্কার করেছেন আল্লাহ-প্রদত্ত নিজের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় ক্ষমতাকে ব্যবহার না করার জন্য

قالت زناهم أن الله شال قاطر السموات والأرض

আল্লাহর ব্যাপারেই সন্দেহ? তিনিই তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১০)

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلَال

আসলে তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, মহাসত্য। তাহলে সে মহাসত্য আল্লাহকে বাদ দিলে চরম বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু থাকে

কি? (সূরা ইউনুস, ১০: ৩২)

তবে এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো। তা হলো—ইসলাম পর্যবেক্ষণ, যুক্তি-বুদ্ধির সুযোগ রেখেছে মানে এই নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাকে ব্যবহার করা যাবে। বরং ইসলাম যে মৌলিক বিশ্বাস উপস্থাপন করেছে—পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি তার কখনোই বিরোধিতা করবে না, করতে পারে না। এটা সম্ভব নয়। আর যখন মৌলিক বিশ্বাস মানুষ অর্জন করে নেবে, ঈমান আনবে, তখন তার দায়িত্ব হলো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করা। তখন আল্লাহ ও রাসূল থেকে যে বিধানই আসে, তা-ই সে মেনে নেয়। প্রত্যেকটি বিধানের ক্ষেত্রে এর যৌক্তিকতা খুঁজতে যায় না।

মানবীয় যুক্তিতর্কের বিরোধী হলেও, আল্লাহর কোনো বিধান বা আহকামের বিরোধিতা করা যাবে না। কেননা আনুগত্য প্রকাশের পরবর্তী বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা, আর আনুগত্যের পূর্ববর্তী বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে আসমান- জমিন পার্থক্য রয়েছে।

কেউ যদি বিচার-বিশ্লেষণ করে ঈমান এনেই ফেলে, তবে যুক্তি দিয়ে একাধিক বিয়ের বিধান, শাস্তির বিধান-সহ ইসলামের কোনো বিধানকে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ বা বর্জন করা চলবে না। কেননা ঈমান আনার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে—বিচার-বিশ্লেষণ করে সন্তুষ্ট হয়েই সে ঈমান এনেছে। তাই ঈমান আনার পর সম্পূর্ণরূপে ওহীর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণ সকল মানুষের এমন ক্ষমতা নেই যে, সকল স্থানে নিজের ইন্দ্রিয়শক্তি-যুক্তি- বুদ্ধি ব্যবহার করে সঠিক বিধান প্রণয়ন করতে পারবে। মানুষের এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে।

প্রতিটি দিকের পূর্ণাঙ্গ সমাধান

একমাত্র ইসলামি জীবনব্যবস্থাই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত সকল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পেরেছে। পৃথিবীর অন্যান্য সকল মতবাদের গণ্ডি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো কোনো ধর্ম পার্থিব জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেনি। কিন্তু বড় বড় বানোয়াট গল্প ফাঁদতে সেই ধর্মের বা ধর্মাবলম্বীদের জুড়ি নেই। আবার কোনো ধর্ম স্রষ্টা, দুনিয়া, আখিরাত বিষয়ে কোনো কথা না বললেও, দুনিয়ার সকল সমস্যা দূরীকরণে আগেভাগে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাদের মাথাব্যথার শেষ নেই। কেউ কেউ অপূর্ণাঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ ভেবে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। কেউ-বা অর্থনীতিকে সকল কিছুর মূল ভেবে, সেই অর্থনৈতিক দর্শন

অনুযায়ী জীবনের অন্যান্য বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। আবার কেউ কেউ যৌনতাকে সকল বিষয়ের মূলে স্থান দিয়ে, যৌনতাকেন্দ্রিক মনোভাব দিয়ে বিশ্বকে দেখার ও জীবনের অন্যান্য মৌলিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। দিনশেষে লাভের লাভ কিছুই হয়নি। ক্ষতিই হয়েছে বেশি। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর আলোকে মানব-জীবনের প্রতিটি সমস্যার পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়েছে। হোক তা বিশ্বাসগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত—প্রতিটি বিষয়েই ইসলামের বিধান আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের বলার কিছু আছে। এভাবে মানব-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই ইসলাম ওহীর চৌকাঠে নিয়ে আসতে পেরেছে। এটা একমাত্র ইসলামেরই কৃতিত্ব। ইসলামের গর্ব। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য মহান এক নিয়ামত। তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুযিজা।

জীবনব্যবস্থার মানদণ্ড হলো ওহী

জীবনে আলোর সন্ধান পেতে হলে আমাদের জীবনব্যবস্থা অবশ্যই দরকার, তবে যেকোনো জীবনব্যবস্থাকে আকড়ে ধরলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। এমন জীবনব্যবস্থা মানুষের প্রয়োজন—যা মানুষকে সত্যিকারের সফলতার পথ দেখাবে, আর সেই জীবনব্যবস্থা অবশ্যই হতে হবে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা বিশুদ্ধ ওহীর ওপর ভিত্তি করে। যেই জীবনব্যবস্থার বেষ্টনী হবে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন। যেই জীবনব্যবস্থায় দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের সমাধান পাওয়া যাবে।

স্রষ্টা অবশ্যই ন্যায়বিচারক। তিনি মানুষের জন্য হিদায়াত পাঠাবেন, আর সেটা কেবল ইবাদাত-উপাসনা পদ্ধতির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তা হতে পারে না। উপাসনার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা থাকবে, আর বাদবাকি ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি- খামখেয়ালিপনা-নিজের অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সমাধান বের করতে হবে—এমন জীবনব্যবস্থা কখনোই আদর্শ জীবনব্যবস্থা হতে পারে না। যেই জীবনব্যবস্থা একদিক থেকে বিশুদ্ধ ওহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত, পাশাপাশি মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রতিটি সমস্যার সমাধান সেখানে রয়েছে, সে জীবনব্যবস্থাই সত্যিকার অর্থে কল্যাণময়। আর সেটা আসতে পারে কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

বলো, আসলে আল্লাহর হিদায়াতই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল হিদায়াত। (সূরা আনআম, ৬ : ৭১)

কুরআন আল্লাহর অবিমিশ্রিত বাণী

পৃথিবীতে অনেক অনেক ধর্ম আছে, আছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ। কুরআন, বেদ, উপনিষদ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল (ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট), গুরুগ্রন্থ ইত্যাদি। অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থে যে মানুষের কথা যুক্ত হয়েছে, তা একেবারেই স্পষ্ট ও চোখে পড়ার মতো। বেদে দেবতাদের কথার পাশাপাশি, তাদের জন্ম, জীবন ইতিহাস, কর্মকাণ্ড, খাবার-দাবার ও অন্দরমহলের ঘটনাও যুক্ত হয়ে আছে। ত্রিপিটক প্রায় সবই গৌতম বুদ্ধের কথাবার্তায় ভরপুর। একে কোনোমতেও স্রষ্টার বাণী বা স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা প্রত্যাদেশ বলা যায় না। (বৌদ্ধধর্ম ওহীভিত্তিক কোনো ধর্মও নয়)। বাইবেলে নবীদের কাহিনি (কোথাও কোথাও অশ্লীলতা যা নবীদের মহান মর্যাদার সুস্পষ্ট বিরোধী), সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, যীশুর বাণী, যীশুর শিষ্যদের বাণী সব একাকার হয়ে আছে। পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থের মাঝেই স্রষ্টার বাণীর সাথে মানুষের কথা, মানুষের হস্তক্ষেপ, মানুষের জীবনী, লম্বাচওড়া গালগল্প, জটিল ও প্যাঁচালো দর্শন পাওয়া যায়। এ ধরনের কোনো গ্রন্থই মানুষকে পথনির্দেশ করতে পারে না।

কিন্তু এক্ষেত্রে একেবারেই ভিন্ন হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম, তাও বাহ্যিকভাবেই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবু বকর, উমার বা উসমানকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে—এমনটা করআনে মোটেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু বৌদ্ধের ধর্মগ্রন্থে বুদ্ধ যে তার শিষ্যদের সম্বোধন করে।

কথা বলছেন, তা তো স্পষ্ট। কুরআনে বেদের মতো দেবতাদের কিচ্ছা-কাহিনি বা তাদের কর্মকাণ্ড কোথাও পাওয়া যাবে না। কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের কথা বা বাণী পাওয়া যাবে না, যেমনটা বাইবেলে যীশুর শিষ্যদের কথা পাওয়া যায়।

জটিল ও লম্বা লম্বা পোশাকী ভাষায় কোনো দর্শন কুরআনে আলোচিত হয়েছে এ বিষয়ে কেউ একটি প্রমাণও দেখাতে পারবে না। কিন্তু ত্রিপিটক-বেদ- উপনিষদে তা হাজার হাজার পাওয়া যাবে। কুরআনের ঐশ্বরিক উৎস নিয়ে হয়তো অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু কেউই এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারবে না যে, কুরআনে কোথাও মানবীয় ভঙ্গিতে কোনো কথা যুক্ত হয়েছে।

এখানে একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। মানুষের মাঝে স্রষ্টার কথা যেভাবে প্রভাব ফেলে, সেভাবে অন্য কারও কথা প্রভাব ফেলে না। হিন্দুধর্মের মৌলিক গ্রন্থ বেদ। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কোন গ্রন্থ ওদেরকে বেশি প্রভাবিত করেছে? শতকরা ৮০ জনই বলবে গীতা। কেন? কেননা গীতার সিংহভাগই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী। তাই যুগ যুগ ধরে বেদের চেয়ে গীতা-ই অধিকহারে মানুষের মন-মনন দখল করেছে। কিন্তু গীতা প্রামাণ্যতার দিক থেকে খোদ হিন্দুদের কাছেই বেদের ধারেকাছেও নয়। কিন্তু যেহেতু গীতায় কৃষ্ণের সরাসরি বাণী পাওয়া যায় (ভাষার মারপ্যাঁচে জটিল দর্শন, জীবনী, সৃষ্টিতত্ত্ব, খুব বেশি পরিমাণে

মানুষের কথা ব্যতিরেকে) তাই তা মানুষকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারে। গীতায় কৃষ্ণের ঈশ্বরসুলভ বর্ণনা শুনে মানুষ কমপক্ষে বেদ আর উপনিষদ থেকে বেশি প্রভাবিত হয়। আর গীতার নামেই তা স্পষ্ট। গীতার পুরো নাম হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যার অর্থ দাঁড়ায় ভগবান বা ঈশ্বরের সংগীত। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে কুরআন এ বিষয়ে বাহ্যিকভাবেই সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার। এটা বোঝার জন্য খুব বড় মাপের বিদ্বান হওয়ার দরকার নেই। খুব বেশি জ্ঞানগরিমা নেই, এমন একজন সাধারণ মানুষও তা সহজেই চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।

تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

এটা (কুরআন) জগৎসমূহের রবের নিকট থেকে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকিয়াহ, ৫৬ : ৮০)

ওহীর সংকলন

আমরা যদি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের দিকে তাকাই, তবে কুরআন বাদে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের সংকলক নিয়ে ও সংকলনের তারিখ নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ পাওয়া যায়। যেমন, বেদের কথাই ধরা যাক। হিন্দুধর্মের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ সমাদৃত। তবে বেদের সংকলক কে? কিংবা কার ওপর বেদ অবতীর্ণ হয়েছিল? এর উত্তরে কিছুই স্পষ্ট করে জানা যায় না। ধারণা করা হয় বেদ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ জ্ঞান, যা মুনিঋষিগণ লিখেছিলেন। অনুমান করা হয় ১৬০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই বেদ লেখা হয়েছিল। বেদকে বলা হয়ে থাকে "অপুরুষেয়"। অর্থাৎ, এটি মানুষের পক্ষ থেকে নয়, এর নির্দিষ্ট কোনো রচয়িতাও নেই।

মানুষের পক্ষ থেকে হোক বা না হোক, কিন্তু কারা এগুলো লিপিবদ্ধ করলেন, কখন করলেন, তারা কেমন মানুষ ছিলেন, কোন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাদের মাঝে ধার্মিকতা কোন মাত্রায় ছিল—এগুলো না জানলে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ বাণী ও মানুষের হস্তক্ষেপের মাঝে পার্থক্য কীভাবে বোঝা যাবে? যেহেতু এগুলোর দিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ মোটেই নজর দেয়নি, তাই তাদের ধর্মগ্রন্থ অনেকাংশেই বিকৃত হয়ে ইতিহাসগ্রন্থে রূপ নিয়েছে। সেখান থেকে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ বাণী ও মানুষের হস্তক্ষেপ—এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করার কোনো উপায় নেই।

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা: দুটো কথা

মানবতা অতীতে ও বর্তমানে অনেক মতবাদ পর্যবেক্ষণ করেছে। রাজনীতিতে গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্র এবং অর্থনীতিতে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম ইত্যাদি । রাজনৈতিক মতবাদগুলো রাজনীতিকে মুখ্য ও অর্থনীতিকে গৌণ মনে করে এবং অর্থনৈতিক মতবাদগুলো অর্থনীতিকে মুখ্য ও মানব জীবনের একমাত্র বুনিয়াদ মনে করে রাজনীতিকে গৌণ বিবেচনা করে। মানব জীবনকে ব্যাপকভাবে অধ্যায়ন না করার ফলেই এসব ভারসাম্যহীন চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে । আমার এ বক্তৃতায় এসব দীর্ঘ রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করার পর আমরা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কোনটা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পাবো ।

রোমান সমাজ ব্যবস্থা

অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা রোমান সভ্যতা ও জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাই, যা দীর্ঘদিন গোটা ইউরোপকে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং যার মূল ভিত্তি ছিল দাসপ্রথা। এই সভ্যতায় স্বাধীন রোমান মানুষের চাইতে দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোমান আইন অনুযায়ী ভিন্ন দেশে যাদের সাথে তাদের কোন চুক্তি ছিল না, রোমানরা নির্বিঘ্নে তাদের ক্ষমতা দখল করে নিতে পারত। রোমানদের জন্য বিশেষ ধরনের আইন আর অ-রোমানদের জন্য ছিল নিকৃষ্ট ভিন্ন আইন, যাকে "দুর্বলের জন্য দ্বিগুন শাস্তি বিধানকারী জাতীয় আইন" নামে কিংবা কুমারীর সাথে অসসুদ্দেশ্য চরিতার্থ করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সম্ভ্রান্ত অভিহিত করা হয়। যেমন, এক আইনে ছিল যে, কেউ যদি কোন সতী বিধবা পরিবারের লোক হয়, তাহলে তাকে নিজ মালের অর্ধেক জরিমানা দিতে হবে এবং নীচু বংশের লোক হলে, তাকে বেত্রাঘাতের পর দেশান্তর করতে হবে। রোমানরা অস্ত্রের বলে প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকায় বিভিন্ন জাতি অসংখ্য যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠলে সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে ।

সামন্তবাদ

এ মতবাদ রাজনৈতিক দিক থেকে মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তোলে। শাসকশ্রেণী হচ্ছে, সামন্তবাদের মুকুটমণি ও সর্বস্ব । তার পরের মর্যাদা হল সম্ভ্রান্ত লোক ও গীর্জার পাদ্রী, তারপর পেশাদার শ্রেণী এবং সর্বশেষ মর্যাদা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমিকদের। এই শ্রেণীর লোকেরা ছিল ভূমিদাস। ভূস্বামীর পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষক এবং জমির মালিকানাও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক বিচারে ভূমি ছাড়া এই ব্যবস্থায় সম্পদ বলতে অন্যকিছু থাকে না যার মালিকানা ভূস্বামীদের পূর্ণ করতলগত। কৃষকরা তাদের মধ্যে বণ্টিত জমি চাষ করবে ও ভূস্বামীদের

স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করবে সামন্ত প্রভু অভূতপূর্ব প্রভাবের অধিকারী শক্তিশালী হয়ে উঠে রী হওয়ায় তাদের চেষ্টায় গীর্জাগুলো

আমরা দেখেছি, খৃষ্টবাদ ইউরোপে দীর্ঘদিন এর অনুসারীদের উপর, "শাসক কাইজারের যা প্রাপ্য আমি তাকে তা দেব এবং আল্লাহকে তাঁর যা প্রাপ্য তা দেব" এই শ্লোগানের ভিত্তিতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল এবং এরই ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা রোমান শাসকদের মর্জিমত ফলে ইউরোপ তার অধিবাসীদের শান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী জীবন ব্যবস্থা মত নিয়ন্ত্রিত হই। ফলে হত । যার উপহার দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে উঠে। মুসলমানগণ ৭১৭ সালে কনষ্ট্যান্টিনোপল ও ৭৩২ সালে ফ্রান্সের পরপাটিয়া বিজয়ের ফলে ইউরোপের প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মুসলমানদের স্পেন বিজয় এবং অন্যদিকে অনবরত ইউরোপবাসীদের ক্রুসেড পাশ্চাত্য জাতিকে তদানীন্তন সভ্যতার ধারক মুসলমানদের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু গীর্জা কর্তৃক সৃষ্ট গোড়ামীর ফলে তাঁরা মুসলমানদের ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তথাপি তারা ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দীর এই দুই শতকে মুসলমানদের চিন্তাধারা থেকে নবজীবনের প্রচুর সামগ্রী লাভ করে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রকৌশল বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ে বর্ধিত জ্ঞান লাভ করায় তাদের আধুনিক ভৌগলিক জ্ঞানের পরিসর অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। যা বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ উপরোল্লিখিত এই নুতন আন্দোলনের সূচনা হয় । রাষ্ট্রের বর্তমান আইন ও সামন্ত প্রভুদের গীর্জার অভিভাবকত্ব এই নব্য গোষ্ঠীর বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, বিজ্ঞান ও সমাজের সবকিছুতে বিস্তার লাভ করে, অবশেষে যা গীর্জার ক্ষমতাকে খর্ব করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ ইউরোপে নুতন এক সুর ধ্বনিত হয় যে, রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। আর এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং এখান থেকেই প্রথম বারের মত সুদ ও তার বৈধতা সম্পর্কে আওয়ায উঠে। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মে এই সুদ নিষিদ্ধ ছিল ।

শিল্প বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক বিকাশের ফলে ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনেরা বিজ্ঞানের এই নব আবিষ্কার থেকে সর্বপ্রথম ফায়দা লুটতে থাকে। কেননা, তারাই তখন সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। ফলে তারা এই নব্য আবিষ্কার, কলা-কৌশল ও প্রশাসনিক যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে 'পুঁজিবাদ' নামক শিল্প ও ব্যবসার এক নুতন ব্যবস্থার জন্ম দেয় ।

পুঁজিবাদ

মূলত পুঁজিবাদের জন্ম হয় ব্যবসায়ী, সুদখোর, পেশাদার ও বিজ্ঞানী এই বুর্জোয়া শ্রেণীসমূহকে অস্বাভাবিক ক্ষমতা এবং সামন্তবাদ ও গীর্জার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কারণে। জাতির কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর নির্যাতিত হওয়াও এর অন্যতম কারণ। সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ী ও অন্যরা স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে সামন্তবাদের অবসান, গীর্জার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ব্যক্তির বাক কর্ম ও ব্যবসার স্বাধীনতা নিশ্চিতকারী এক মতবাদ কায়েমের জন্য চেষ্টা চালায় । যার ফলে ফরাসী বিপ্লবসহ কতিপয় রাজনৈতিক বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের মূল শ্লোগান ছিল, 'লেইসেস ফেয়ার' অর্থাৎ "অবাধ কাজ করতে দাও ও চলতে দাও।"

আশ্চর্যের বিষয় হল, স্বাধীনতার এই প্রবক্তারা বিজয় লাভ করার পর নিজেরা রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্ণধার হয় বটে কিন্তু কৃষক-শ্রমিকসহ সামন্তবাদের নির্যাতিত আপামর জনতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাণ্ডারী হওয়ার কোন সুযোগ পায় না । পরিণামে এই স্বাধীনতা সুদখোর মহাজন ও পুঁজিবাদিদের সম্পদ বৃদ্ধি সহায়ক উপায়ে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্র অন্যদের জন্য নয় বরং তাদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা নিজেদের পণ্যজাত দ্রব্যের বাজার অন্বেষণ করে ও সস্তায় কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুঁজতে থাকে । তারাই রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীকে উপনিবেশ সৃষ্টি করতে বাধ্য করে, অতঃপর লোকদেরকে নির্দয়ভাবে গোলামে পরিণত করে ।

পুঁজিবাদের গোড়ার কথা হল, ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের মালিক সে নিজেই, এতে অন্য কারোর অধিকার নেই, নিজ ইচ্ছামত সে তা ভোগ ব্যবহার করবে, এতে কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা থাকতে পারবে না। সে নিজের ইচ্ছামত মওজুদদারী গড়ে তুলতে পারবে এবং কেবল নিজের মর্জি অনুযায়ী এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। এতে অন্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা দেখার প্রয়োজন নেই । সুদকে সে বৈধ মনে করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সুদী মহাজন ও মালিক পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যাপারে (যারা ধনীদের তুলনায় দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে) রাষ্ট্রের তেমন কিছু করার নেই, নেই কোন ধর্মীয় ও নৈতিক বাধা। তাদের শ্লোগান হল "ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর জন্য এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সবার জন্য।"

এর ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে এবং গরীব আরো গরীব হয়। শিল্পপতিরা নিজেরাই একা শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ করে। কোন সময় বিনা বেতনে, বিনা ছুটিতে ও কাজের সময় সীমা নির্ধারণ করা ছাড়াই কাজ আদায়ের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। শ্রমিকদেরকে প্রদত্ত কম বেতনে (তাদের সংসারতো চলেই না, উপর পুঁজিবাদীরা নারী ও শিশুদের থেকেও স্বল্প বেতনে তাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে) সেবা আদায় করে, ফলে তাদের রোগ-শোক ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্বের হারও বেড়ে যায় তার এ সবের ফলে সৃষ্ট

ঘৃণা ও বিদ্বেষ গরীবদেরকে মুক্তির আশায় হিংসাত্মক অন্য আর এক নুতন বিপ্লব সাধন করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার শ্লোগানই হল হত্যা ও রক্তপাত এবং নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। আর এই ব্যবস্থার নামই হল কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র ।

কম্যুনিজম

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূলকথা হল, উৎপাদন উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। ব্যক্তি এসবের মালিক হতে পারবে না এবং নিজ ইচ্ছামত এগুলোর ভোগ-ব্যবহারও করতে পারবে না । কাজের বিনিময়ে রাষ্ট্র থেকে তারা ভাতা লাভ করবে। সমাজের দায়িত্ব হল নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা দেখা । সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা ও উত্তরাধিকারের কোন অস্তিত্ব নেই। কম্যুনিষ্টরা ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করে ও ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্য "নিষিদ্ধ আফিম" স্বরূপ। এই মতবাদ শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান জানায় ।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদসহ পৃথিবীতে আরো অনেক মতবাদ রয়েছে। আমি এগুলো সম্পর্কে আর অধিক আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু সংক্ষেপে এতটুকু বলব যে, হিটলার ও মুসোলিনীর জীবদ্দশায় বিজয়ের মুহূর্তে এর কিছু অনুসারী থাকলেও পরবর্তীতে ইতিহাসের বিবেচনায় এ দু'টি ছিল একনায়কত্ব-বাদী শাসন, যা জাতির লোকদেরকে কল্যাণ ও প্রশান্তি দান করতে সক্ষম হয়নি ।

মানবীয় মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত সার

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা দেখেছি কি করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নিজেদের তৈরী মনগড়া মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে। একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট, মানুষ নিজেই একান্ত নিজের জ্ঞান থেকে আইন তৈরী করতে পারে না। কেননা, মানবীয় জ্ঞান কোন সময়ই স্বার্থপরতা ও ত্রুটিমুক্ত নয়। অনেক সময় কাজ বিশেষের প্রতি তার ৮ নয় যে যা দেখে তাকেই সে বাস্তব

ও সত্য সে ও অগ্রাধিকারও থাকে । বস্তুত জগতে চোখে মনে করে আর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত বিষয়াবলীকে সে সত্য মনে করে না।

তাই দেখা যায়, এসব মতাদর্শে কেবল কৃষি, শিল্প উৎপাদন ও অপরাপর বস্তুগত ব্যাপক উন্নয়নের চিন্তা করা হয় এবং মানুষের অনুভূত প্রয়োজনসমূহ যেমন ভাত-কাপড়, বাসস্থান ও যৌন চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। অথচ এ ব্যবস্থায় মানুষের রূহানী ও আত্মিক প্রয়োজনের কথাকে স্বীকার করা হয় না এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের জিনিসগুলোকে অস্বীকার করা হয় । আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নৈতিক-চারিত্রিক গুণাবলী স্বীকার করা হয় না । ফলে মানুষ এই পার্থিব জীবনে বস্তুগত উন্নয়ন লাভ করলেও এগুলো ঈমান ও বিশ্বাসের অভাবে প্রাণহীন বিষয়ে পরিণত হয় এবং পরে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই মতবাদে যৌনক্ষুধা পূরণ করাকে সহজলভ্য করা হয়, পারস্পরিক সংঘর্ষে ঘুম দূরীভূত হয় ও জীবন কলুষিত হয়ে ওঠে, শরীর ও মনের আরাম হারাম হয়ে যায়। সেখানকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ তখন ব্যক্তি ও তার আত্মা থেকে শুরু করে দল, দেশ, সেনাবাহিনী, জংগী বিমান, কামান ও যমীনের ধ্বংসলীলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে।

উপরে বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি, মানবতা আজ দুনিয়া ও পরকালের সমন্বয় সাধনকারী, আত্মা ও বিবেকের প্রয়োজন পূরণকারী এবং মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধনকারী উপযুক্ত এক জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছে। তাই এ মুহূর্তে মানুষের অতীতের দুঃখ দুর্দশা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়ানো মানবতা তাকে হাতে ধরে উদ্ধার করার জন্য এক পরিত্রাণকারী অপেক্ষায় দিন গুনছে, ব্যাকুল আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে এমন এক অনুগ্রহপূর্ণ সময়ের যখন কোন দয়ালু শক্তি তাকে ভালবাসা ও প্রশান্তির দিকে আহ্বান জানাবে।

ইসলাম হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক যে জীবন বিধান মানুষের প্রয়োজন, তার সন্ধান লাভ করার জন্য জ্ঞানের অবসাদগ্রস্ততা দূর করে খোলা মন নিয়ে জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাবো, সে জীবন ব্যবস্থাটি হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। যার মধ্যে নেই কোন বক্রতা, বিভ্রান্তি ও অকল্যাণ, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ নিজেই এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, ফেরেশতা এবং সব জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্যই দিচ্ছেন । (আলে ইমরান : ১৮)

এই ইসলাম সেই মন্ত্রের ইসলাম নয় যা মুখস্থ পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়, আর না তা কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম যা আদায় করলে আর কিছু করার থাকে না । বরং এ হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাংগীন ও পূর্ণাঙ্গ এক জীবন ব্যবস্থা এ প্রসংগে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ١٩

ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শ । (আলে ইমরান : ১৯)

তিনি আরো বলেন :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

ইসলাম ব্যতীত যারা অন্য কোন জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহ কখনো তা গ্রহণ করেন না । (আলে ইমরান : ৮৫)

এই জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করলেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম । (আল মায়েদা : ৩)

আল্লাহ বলেন :

وَابْتَغِ فِيْمَا أَتٰكَ اللهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ -)القصص

আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা পরকালের ঘর বানিয়ে নাও, দুনিয়ার হিসেবকেও ভুলো না এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করেন তোমরাও অনুরূপ অনগ্রহ প্রদর্শন করবে। (আল কাসাস : ৭৭)

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾

আল্লাহ তার রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীন নিয়ে এজন্য পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এটাকে অন্যান্য সব মতাদর্শের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও তা মুশরিকদের পছন্দনীয় নয়। (আত তাওবা : ৩৩, আস্ সফ : ৯)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ ইসলামকে মানবতার জন্য নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন যাতে মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে । এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেন:

وَمَا أَتٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ - وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -)الحشر

হযরত মুহাম্মদ (সা) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যে সব কাজ থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাক । (আল হাশর : ৭)

কুরআনের কিছু অংশকে গ্রহণ করা এবং বাকী অংশগুলোকে গ্রহণ না করা মারাত্মক অন্যায় ও সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ধারণা। এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ - فَمَا جَزَاءُ مَنْ يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ الأخرى في اليوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيمَة ،

তোমরা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করবে? এমন যদি কেউ করে তাহলে এ দুনিয়ায় তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। (আল বাকারা : ৮৫)

হাদীসে এসেছে নবী (সা) বলেন, এতে "ইসলামে বৈরাগ্যের ঠাঁই নেই।" মোটকথা, ইসলাম হচ্ছে বিশ্বাস ও ইবাদত, রাজনীতি ও নেতৃত্ব, অর্থনীতি ও আইন, যুদ্ধ ও শান্তির নীতি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ ও প্রশিক্ষণের জন্য এক নিখুঁত ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এসব কথাগুলো আমি আবেগের বশবর্তী

হয়ে বলছি না বরং আমি এখন ইসলামের কতিপয় দিক বিশ্লেষণ করে এর যথার্থতা প্রমাণের প্রয়াস পাব।

ক. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 'যোগ্য নাগরিক' সৃষ্টি করা, যদিও নাগরিক ও তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন কোন সংজ্ঞা নেই। কেননা, বিভিন্ন জাতির নিকট এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কোন দেশে এর অর্থ হল অন্যায় ও বিদ্রোহ দমন করা কিংবা বিদ্রোহ দমনে অতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা অথবা সে এমন একজন ভাল লোক যে অন্যায় ও বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না, কোন সময় সে আবেদ হয় যে পার্থিব জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে, কোন সময় সে দেশপ্রেমিক হয় ও নিজস্ব বর্ণ রক্ষার জন্য উন্মাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতদসত্ত্বেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এরা সবাই দেশের যোগ্য নাগরিক । ইসলাম নিজেকে এহেন সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করেনি। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক নয় বরং 'যোগ্য মানুষ' গড়ার ব্যাপক লক্ষ্য অর্জন করতে চায় ।

মানুষ শব্দটি ব্যাপক মনুষত্ব 'অর্থবোধক'। এই অর্থে মানুষ শুধু নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের নাগরিকই নয়, এরও ঊর্ধ্বে উঠে সে হচ্ছে কেবল 'মানুষই' । কুরআন মানুষকে ইসলামী শিক্ষার এই ব্যাপক ধারণা দান করতে গিয়ে বলেছে :

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

অর্থাৎ এই হচ্ছে গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য উপদেশ। (আত তাকবীর : ২৭)

আল্লাহ বলেন : 'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু সে আল্লাহর নিকট ততবেশী সম্মানিত।'

ইসলামের এই শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, আত্মা বৈষয়িক ও নৈতিক সর্বদিক ব্যাপৃত । ইসলাম মানুষকে শরীর জ্ঞান ও আত্মার সমন্বিত এক পূর্ণ অবয়ব মনে করে । এগুলোসহ তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক যাবতীয় কাজের সর্বাত্মক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট মানুষের স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট্যের উপর কোন যোগ বিয়োগ করা যায় না। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল এটি ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবীয় কাঠামো হল শরীর, আত্মা ও বিবেকের সমন্বিত নাম । এগুলো বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয় কিংবা এমনও নয় যে একটার সাথে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই । ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মা বিশেষ এক নিয়ামত এবং শরীরের কেন্দ্রবিন্দু ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির বাহন। ইসলামে আত্মার প্রশিক্ষণ বলতে বুঝায় সকল কাজ, চিন্তা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক ও সংযোগ সংঘটিত হওয়া। আল্লাহ মানুষকে অসম্ভব কোন কাজের হুকুম দেন না ।আল্লাহ মানুষকে যথাসাধ্য আল্লাহভীরু হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ -)التغابن

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহভীরু হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর । (আততাগাবুন : ১৬)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَ لۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّهُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ ﴿۱۸۶﴾

আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কাজের হুকুম দেন না। (আল বাকারা : ১৮৬)

এই ব্যবস্থায় মানুষকে পশুসুলভ জড়বাদী প্রাণী হিসেবে বিবেচনাকারী মতবাদকে অস্বীকার করা হয়, যা মানুষকে যৌন কামনার দিকে আহ্বান জানায় এবং তাদের উঁচু মর্যাদাকে অস্বীকার করে তাদেরকে ভোগবাদী প্রাণীতে পরিণত করে এবং তাদের শেষ পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম ।

খ. ইসলামী অর্থনীতি

জড়বাদী অর্থনীতিবিদদের মত ইসলাম মানুষকে অর্থনৈতিক জীব হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে তাদের জৈবিক চাহিদা, ইচ্ছা আকাঙ্খা ও আবেগ পূরণ করার সাথে সাথে তার ব্যক্তিসত্তাকে মৌলিক গুরুত্ব দিয়ে এক নিপুণ অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। শুধু সামগ্রিক সত্তার উপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব এজন্য আরোপ করা হয়নি যে কাউকে সত্যিকার অর্থে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হতে পারে না। জীবিকা অর্জনে

স্বাধীনতা না থাকার অর্থ হল তার মূলতই কোন স্বাধীনতা নেই। আমি ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক বিষয়ের উপর এখন আলোচনা করব

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ

প্রথমতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ আল্লাহর, মানুষ এতে আল্লাহর প্রতিনিধি ।কোন মুসলিম একথা বলতে পারে না যে, আমার জ্ঞানের বদৌলতে আমাকে এ সম্পদ দান করা হয়েছে। বরং সে সব সময় যে কথা স্মরণ করে তা হচ্ছে :

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخلفين فيه - الحديد

তিনি যে সম্পদে তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন সে সম্পদ থেকে খরচ কর। (সূরা হাদীদ : ৭)

জাতীয় কল্যাণের সাথে সংগতি রেখে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ

দ্বিতীয়তঃ জাতীয় কল্যাণের সাথে সংগতি রেখে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে। উত্তম লোকের উত্তম মাল কতই না উৎকৃষ্ট। একটাই শর্ত তা হল, অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।

ব্যক্তির মালিকানার উপর আরোপিত শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

এক. আয়ের উৎস হারাম হতে পারবে না এবং হারাম কাজে অর্থ ব্যয়িত হতে পারবে না । কুরআন বলছে :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ - وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ

হে মুমিনগণ, অন্যায়ভাবে তোমরা একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না, হ্যাঁ, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসা ব্যতীত (অর্থাৎ তা ভোগ করতে পারবে)। নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। যে অন্যায়ভাবে তা করবে খুব শীঘ্রই আমরা তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো । তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবে (সূরা নিসা : ২৯-৩০)

মওজুদদারী নিষিদ্ধ :

আল্লাহ বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

যারা সোনা-রূপা জমা রাখে ও তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক কঠিন আযাবের সুসংবাদ দান কর। (সূরা আত্ তাওবা : ৩৪)

উল্লেখ্য যে, লর্ড কেইনসহ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মওজুদদারীর কুফলের কথা স্বীকার করেছেন, যার ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় । অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে। তিন. অপব্যয় না করা :

আল্লাহ বলেন :

(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ - بنى اسرائيل :٢٧

নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই । (বানী ইসরাইল : ২৭)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُورًا - بنى اسرائيل : ٢٩)

তোমাদের দানের হাত গুটিয়ে একেবারে গলদেশ পর্যন্ত আটকে রেখো না কিংবা সম্পূর্ণ উন্মুক্তও করে দিও না, যার ফলে তুমি পরবর্তীতে আফসোস করতে থাকবে এবং লোকদের নিকট তিরস্কৃত হতে থাকবে। (সূরা বানী ইসরাইল : ২৯) কুরআন আরো বলছে :

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ -)الاعراف:

তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় কর না। আল্লাহ অবশ্যই অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা আ'রাফ : ৩১)

কুরআন কার্পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে বলেছে :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما اتهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا.

এর জন যারা আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের কার্পণ্য করে তারা যেন তাদের এ কাজকে উত্তম বলে মনে না করে, বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। (সূরা আলে ইমরান : ১৮০) চার. ইসলামী রাষ্ট্র দুর্বল, অসহায় লোকদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে। তাই মালিক থেকে শ্রমিকের অধিকার আদায় ও তা সংরক্ষণ করা, নিম্নতম বেতন ও কাজের অধিক সময় সীমা নির্ধারণ ও কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়ার পর পেনশন ধার্য করার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে ।

কুরআন বলছে :

وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ

لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ -)البقرة :٢٨٢(

আর লিখাবে ও লেখ্য বিষয় বলে দেবে ঋণগ্রহীতা । স্বীয় রব আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে, তাতে যেন কোন প্রকার কম-বেশী করা না হয় । কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখ্য বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক যাতে ইনসাফ সহকারে লিখিয়ে দেয় । (সূরা বাকারা : ২৮২) স্মরণযোগ্য যে, ইউরোপে এসব অধিকার পূরণ হচ্ছে না বলে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে এসব আদায়ের চেষ্টা করছে। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং অনেক দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও শান্তির ভিতকে নাড়িয়ে তুলছে। অথচ ইসলাম মানব রচিত মতবাদের

অনেক পূর্বেই দুর্বল ও শ্রমিকের অধিকারের পন্থা বাতলিয়েছে। এমনকি ইসলামের প্রথম খলিফা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন :

'তোমাদের দুর্বলরা আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তাদের অধিকার আদায় করতে পারি ।'

রাষ্ট্র অনুরূপভাবে মওজুদদারী ও জুয়াসহ ইত্যাকার হারাম ব্যাপারে যে কোন সময় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

তৃতীয়তঃ কুরআনের আয়াত সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ বলেন :

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبوا -)البقرة

আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন । (সূরা বাকারা : ২৭৫)

আল্লাহ বলেন :

واخذهم الربوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ.

তাদেরকে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কথা বলা সত্ত্বেও তারা সুদ গ্রহণ করছে। (সূরা নিসা : ১৬১)

আল্লাহ বলেন :

يَمْحَقُ الله الرّبوا وَيُرْبِي الصَّدَقْتِ -)البقرة

আল্লাহ সুদকে বিনষ্ট করেন ও সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। (সূরা বাকারা : ২৭৬)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَا أَتَيْتُمْ مِّنَ الرِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَايَرْبُوا عِنْدَ

মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দান কর, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না । (সূরা রূম : ৩৯)

নবী (সা) বলেন :

- الأَوَانَّ الرِّبَا مَوْضُوعَ وَاَوَّلُ رِبَا اَبْدَابِهِ رِبَا عَمَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

নিশ্চয়ই সুদ পরিত্যাজ্য এবং সর্বপ্রথম আমি যে ব্যক্তির সুদ বন্ধ করেছি তিনি হচ্ছেন আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব ।

এমনকি মুসলমান সংস্কারকরা পর্যন্ত সুদের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করতে ইতস্ততঃ বোধ করত। তারা এই বলে প্রতারিত হত যে, বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির চাকা হচ্ছে সুদ । কাজেই সুদ ছাড়া অর্থনীতি অচল । আল্লাহ সুদখোরদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করলেন কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ও বিশ্বে আর্থিক নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে। এ যেন তাঁরই সেই সতর্ক বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন যেখানে তিনি বলেছেন :

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا فَاۡذَنُوۡا بِحَرۡبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ ۚ وَ اِنۡ تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوۡسُ اَمۡوَالِكُمۡ ۚ لَا تَظۡلِمُوۡنَ وَ لَا تُظۡلَمُوۡنَ

যদি তোমরা সুদ বন্ধ না কর তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। যদি তোমরা তওবা কর তাহলে

তোমাদের পুঁজি তোমাদের নিকট ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে। না তোমরা জুলুম করবে, না তোমাদের উপর জুলুম করা হবে। (সূরা বাকারা : ২৭৯) বিশ্ব সুদখোরদের ব্যাপারে আল্লাহর এই বক্তব্যও প্রযোজ্য যাতে তিনি বলেছেন :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبوا لايَقُومُونَ الاكَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ منَ الْمَس -)البقرة :

যারা সুদ গ্রহণ করে তারা শয়তানের স্পর্শ দ্বারা জ্ঞান শূন্য পাগল লোকের ন্যায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায় । (সূরা বাকারা : ২৭৫)

পরে হলেও অনেক অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেছেন যে, সুদের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এতে গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ জমা হয় যা পরিণতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ টেনে আনে। কম্যুনিজমেও সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর সুদের পক্ষে বস্তুবাদী লোকদের যুক্তি উত্থাপনের প্রচেষ্টা হাস্যকর ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে ।

গ. সামাজিক যিম্মাদারী

চতুর্থতঃ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয় ও অনাত্মীয় লোকদের সাহায্য করা কর্তব্য । অক্ষম পিতাকে লালন-পালন করা সন্তানের দায়িত্ব এবং পঙ্গু সন্তানকে লালন-পালন করা পিতার কর্তব্য। ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিক পক্ষ যদি কর্মচারীদের বেতন ভাতা ঠিকমত না দেয় তা আদায় করে দেওয়াও কর্তব্য। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) এক ধনী ব্যক্তিকে শাস্তি দানের ধমক দিয়েছিলেন। কেননা, তার এক শ্রমিক চুরি করেছিল। কারণ অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হল, শ্রমিককে তার নিম্নতম প্রয়োজন পূরণ করার মত বেতন দেয়া হয় না বলে সে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বোপরি, তিনি রাষ্ট্রের প্রতিটি লোকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করাকে রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে স্থির করে দেন। সাময়িক বেকার, এতিম সন্তান, রোগীর চিকিৎসা, অভুক্তদের খাবার দান, উলঙ্গকে কাপড় দান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম লোকদের সাহায্য করা হচ্ছে উত্তম সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যা ইসলামী রাষ্ট্রে অবশ্য করণীয় । ইসলাম যা চায় তা হল সম্পদ সমাজের কোন এক জায়গায় কুক্ষিগত না থাকুক এবং যারা নিজেদের ভাগ্য ও যোগ্যতার বদৌলতে বাড়তি সম্পদ অর্জন করেছে তা মওজুদ রাখা না হোক বরং সম্পদের আবর্তনের দ্বারা ভাগ্য নিপীড়িত ও বঞ্চিত লোকদের প্রতি তা খরচ করা হোক । এজন্যই ইসলাম দান ও সামাজিক সহযোগিতার প্রবণতাকে নিজস্ব উন্নত নৈতিক চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং দান ও খরচ করাকে উৎসাহিত করেছে এবং মওজুদদারীকে নিরুৎসাহিত করেছে ।

যাকাত

পঞ্চমতঃ সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করে সমাজের সমৃদ্ধি ও কল্যাণে ব্যয় করার নিয়মকে ইসলামে যাকাত বলা হয় । ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামে নামাযের পরই যাকাতের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয় । আল্লাহ বলেন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا -)التوبة

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র কর । (সূরা আত্ তাওবা : ১০৩)

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। প্রত্যেক বছরের সংগৃহীত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহর রাস্তায় না দিলে মাল পবিত্র হয় না । আল্লাহ নিজে যাকাতের মুখাপেক্ষী নন। যাকাতকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার তাৎপর্য হল, অভাবী লোকের কল্যাণ, জমিনের আবাদী ও কল্যাণমূলক শিল্প উন্নয়ন খাতে তা ব্যয় করা । এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য :

إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ

যাকাত হচ্ছে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোক, যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী, অমুসলিমদের অন্তর জয় করার কাজ, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত লোক, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ও মুসাফিরদের জন্য । (সূরা আত্ তাওবা : ৬০)

এখানে উল্লেখ্য যে, যে মালের যাকাত দেয়া হবে, সে মাল মওজুদদারীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় যদি পুঁজি বিনিয়োগ করা না হয় এবং বছর বছর যাকাত দেয়া হয়, তাহলে জমাকৃত সম্পদ মাত্র ৪০ বছরের কম সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমাজে কত বেশী কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনতে পারে ইতিহাস থেকে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর শাসনামলের দিকে তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারি। তিনি যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীদেরকে যাকাত সংগ্রহ করে তা গরীব মুসলমানদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। অতঃপর যখন সমগ্র দেশ খুঁজেও কোন গরীব মুসলমানের সন্ধান পাওয়া গেল না তখন খলিফা উক্ত অর্থ অমুসলমান গরীবদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। গোটা দেশ ঘুরে এসে কর্মচারীরা বললেন, হে খলিফাতুল মুসলেমিন ! ইসলামের শাশ্বত ও কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থার ফলে শুধু মুসলমান নয়, অমুসলমান গরীবরা পর্যন্ত ধনী হয়ে গেছে। তাই এই যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার মত উপযোগী লোক দেশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা এখন কি করব? খলিফা বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, এই অর্থ এখন রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় কর ।

ঘ. উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ

ষষ্ঠতঃ ওয়ারিশদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ও সূক্ষ্মভাবে সম্পদ বণ্টন এবং বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ইসলামের উত্তরাধিকার আইন মানুষের তৈরী পদ্ধতি থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। কুরআন ও হাদীসের যে কোন পাঠকের কাছে প্রথমেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, মৃত ব্যক্তির ৩ ভাগের ২ ভাগ সম্পদে নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকার সূত্রকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশে উত্তরাধিকারকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের জন্য অসিয়ত করা যেতে পারে। তবে তা কোন মতেই ওয়ারিশের জন্য হতে পারবে না। যাতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হিস্সা বিকৃত না হয় । এভাবেই সম্পদ একজনের কাছে জমা না হয়ে অনেকের নিকট ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরাধিকারহীন ব্যক্তির সম্পদ রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হবে যার দ্বারা গোটা জাতি উপকৃত হবে। এটা না করে মুখ ডাকা ছেলে বানিয়ে তাকে উত্তরাধিকারী বানানো যাবে না ।

উত্তরাধিকারহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় মীরাসের মাধ্যমে পরিবারের লোকদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হচ্ছে মধ্যমপন্থী সমাধান। পুঁজিবাদে মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মালিকের মৃত্যুর পর উক্ত সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা কিংবা বৃটেনের পিতার বড় সন্তান সমস্ত সম্পদ লাভ করার মত জঘন্য ব্যবস্থা থেকে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনেক শ্রেষ্ঠ। এর মাধ্যমে পরিবারকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা সমাজের মূল ইউনিট হিসেবে বিবেচিত । যে মুহূর্তে পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে সে মুহূর্তে সে খোদ সমাজেই প্রবেশ করছে ।

বঞ্চিত লোকদের প্রতি তা খরচ করা হোক । এজন্যই ইসলাম দান ও সামাজিক সহযোগিতার প্রবণতাকে নিজস্ব উন্নত নৈতিক চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং দান ও খরচ করাকে উৎসাহিত করেছে এবং মওজুদদারীকে নিরুৎসাহিত করেছে ।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক মৌলিক বিষয়। এতে কোন নৈরাজ্য থাকতে পারে না এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন রয়েছে সৎ নেতৃত্বের। ইসলামের দুশমনরা কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে এ সংশয় ঢোকাতে সক্ষম হয়েছে যে, ইসলামে রাজনীতি নেই এবং ইসলাম এ নিয়ে মাথা ঘামায় না । ফলে তারা দীনকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে । অথচ তারা আল্লাহর সেই সতর্ক বাণীকে ভুলে গেছে। যাতে তিনি বলেন :

.

فَلاَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

হে রাসূল, আপনার রব-এর কসম, এরা কখনো মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের ঝগড়া বিবাদের ফয়সালার জন্য শাসক মেনে নেয়, আপনার ফয়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন সন্দেহ পোষণ না করে এবং আপনার ফয়সালাকে হুবহু গ্রহণ করে । (সূরা নিসা : ৬৫)

আল্লাহ আরো বলেন :

: أَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -)النساء

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেসব লোকদের যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। (সূরা নিসা : ৫৯)

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ থেকে আমি নিম্নে এর কয়েকটি পেশ করব।

১. শাসন করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর

শাসন করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর, আর কারোর নয়। আল্লাহ বলেন :

قُلۡ اِنِّیۡ عَلٰی بَیِّنَۃٍ مِّنۡ رَّبِّیۡ وَ كَذَّبۡتُمۡ بِهٖ ؕ مَا عِنۡدِیۡ مَا تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ بِهٖ ؕ اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ یَقُصُّ الۡحَقَّ وَ هُوَ خَیۡرُ الۡفٰصِلِیۡنَ

শাসন চলবে কেবল মাত্র আল্লাহর। (সূরা আল আন'আম : ৫৭)

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

"তিনি যা ইচ্ছা সব কিছু করেন।" (সূরা আল বুরূজ : ১৬)

فَسُبۡحٰنَ الَّذِیۡ بِیَدِهٖ مَلَكُوۡتُ كُلِّ شَیۡءٍ وَّ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ

"ক্ষমতার বাগডোর তারই হাতে নিহিত"। (সূরা ইয়াসীন : ৮৩)

"কোন শক্তি তাঁর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি লোকদেরকে সাহায্য করেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারে না। কোন ব্যক্তি, কিংবা রাষ্ট্র মানুষের উপর তাদের নিজেদের রচিত আইন চাপিয়ে দিতে পারে না । আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন :

- اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء

তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে যে আইন-বিধান নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর আইনের অনুসরণ করো না। (সূরা আ'রাফ : ৩)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -)المائدة

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা হল কাফের। (সূরা মায়েদা : ৪৪)

এখন একথা পরিষ্কার যে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং তিনিই যাবতীয় ক্ষমতার উৎস ।

২. পরামর্শ

শাসন ব্যবস্থা পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۞ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।(সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

নবী (সা) বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ مؤمرًا أَحَدًا دَونَ مُشوَرَة الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُ بنِ أُمِّ عَبْد .

মুমিনদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত যদি আমি কাউকে আমীর নিযুক্ত করতাম তাহলে সে ব্যক্তি হত ইবনে উম্মে আবদ্।

এখন প্রমাণিত হল যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য। কেননা, স্বয়ং নবী করীম (সা) পর্যন্ত পরামর্শ ব্যতীত কাউকে আমীর নিয়োগ করার অধিকার রাখেন না। পরামর্শের পদ্ধতি কি হবে ইসলাম তা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। স্বভাবতই স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর পার্থক্য সূচিত হতে পারে। নবী করীম (সা)-এর সময় তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট তদানীন্তন সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল চিন্তাবিদ সাহাবায়ে কেরামদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে অহী নাযিল হয়নি সেসব ব্যাপারে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে বাক স্বাধীনতা ও জাগতিক কর্ম সংঘটিত করার স্বাধীনতা দিতেন। কেননা, কৃষি ও অন্যান্য জ্ঞানগত ব্যাপারে দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের রায় দেয়ার যোগ্যতা ছিল।

৩. অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব

রাষ্ট্রীয় শাসন হচ্ছে অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব। শাসক আল্লাহ ও বান্দাহর নিকট দায়ী থাকবে। শাসক জনগণের বেতনভুক্ত কর্মচারীও বটে । হাদীসে উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ

- عَنْ رَعيته

তোমাদের প্রত্যেকেই যিম্মাদার এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নেতাও অনুরূপ যিম্মাদার, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

খলিফা আবু বকর (রা) শাসনভার লাভ করার পর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন :

أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ أَحْتَرِفُ لِعَيَالِي فَاكْتَسِبُ قُوْتَهُمْ فَأَنَا الْأَنَ

- اَحْتَرِفُ لَكُمْ فَافْرِضُوا لِي مِنْ بَيْتِ مَالِكُمْ

হে লোকেরা! আমি কাজ করে পরিবারের জন্য উপার্জন করতাম, এখন আমি আপনাদের জন্য কাজ করছি। আপনারাই আমার জন্য বায়তুল মাল থেকে একটা ভাতা নির্ধারিত করে দিন।

খলিফার আনুগত্য জাতির উপর কর্তব্য । আল্লাহ বলেন :

. أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ

তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও শাসকের আনুগত্য কর । (সূরা নিসা : ৫৯) তবে অন্যায় কাজে আনুগত্য করা যাবে না ।

হাদীসে রয়েছে :

- لاطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'আল্লাহর নাফরমানীতে কোন আনুগত্য নেই ।'

রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতার দায়িত্বানুভূতি হযরত ওমর (রা)-এর হৃদয়ের গভীরে নাড়া দিয়েছিল। খেলাফতের দায়িত্বের ভারে তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর কন্যা জিজ্ঞেস করলেন, আব্বা কেন কাঁদছেন? আপনি তো দুনিয়াতেই আগাম বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন, ইরাকের রাস্তায়ও যদি পা পিছলিয়ে কোন গাধা পড়ে যায় সে জন্য আমাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে, কেন আমি উক্ত রাস্তা মেরামত করিনি।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেন :

فَإِنْ رَأَيْتُمُونِي عَلَى حَقٌّ فَاعِيْنُونِي وَإِنْ رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِل

- فَسَدُدُونِي أَوْ قَوْمُوْنِي

যদি তোমরা আমাকে সত্যের উপর চলতে দেখ তাহলে আমাকে সাহায্য কর, আর যদি অসত্যের উপর চলতে দেখ তাহলে আমাকে সোজা করে দাও।

৪. জাতীয় ঐক্য

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার চতুর্থ মূলনীতি হল জাতীয় ঐক্য। মিল্লাতে ইসলামিয়া একই উম্মত । ঈমান তাদেরকে একই উম্মতের অনুসারী করে দিয়েছে কুরআন বলছে :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।

কুরআনে আরো আছে :

তোমাদের এই মিল্লাত একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, আমি তোমাদের প্রভু, তোমরা আমার ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া : ৯২)

হাদীসে এসেছে :

الْمُسْلِمُ أخوا الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ .

‘একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানের ভাই, সে তার ভাইয়ের উপর করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না ।

জুলুম

এখানে তারা মামা ‘দীন হচ্ছে উপদেশ' হাদীসে বর্ণিত এই নীতির সার্থক বাস্তবায়ন করে, একে অপরকে সৎ উপদেশ দান করে। মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য না হয়ে যদি ছোট-খাট শাখা-প্রশাখার পার্থক্য হয়, তাহলে এতে কিছু আসে যায় না এবং এ জন্য শত্রুতা, বৈরিতা ও লাঠা-লাঠি করা নিষ্প্রয়োজন। কোন এখতেলাফের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি কোন বক্তব্য না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে সমাধান বের করতে হবে এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বিত মতামত গ্রহণ করে প্রশাসক উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন ।

৫. সাম্য

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পঞ্চম মূলনীতি হল সাম্য। ইসলাম সবার জন্য সাম্যকে ফরয করে দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন :

يا أَيُّهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ.

হে মানুষ, আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাবান, তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু। (সূরা হুজরাত : ১৩)

হাদীসের মধ্যে আরো পরিষ্কারভাবে এসেছে :

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لأَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَحْمَرَ إلا بِالتَّقْوى -

মানুষ চিরুনীর দাঁতের অনুরূপ সমান। অনারবের উপর আরবের কিংবা লালের উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, হ্যাঁ, পার্থক্য শুধু আল্লাহভীতির ভিত্তিতে নবী (সা) এর উপর আরো জোর দিয়ে বলেন :

- إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهُمْ بابائِهِمْ فَالنَّاسُ لِأَدَمَ وَأَدَمَ مِنْ تُرَابٍ

আল্লাহ ইসলামের বদৌলতে বংশের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের মিথ্যা গর্ব ও অহংকার থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। সব মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট ।

৬. স্বাধীনতা

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ষষ্ঠ নীতি হচ্ছে স্বাধীনতা। ইসলামে চিন্তা, বিশ্বাস ও বক্তব্যের স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি সত্যের জন্য এবং বাস্তব বিরোধী কিছুর বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করাকে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। কুরআনে এসেছে :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে । আল্লাহর নবী বলেন :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
- فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় দেখবে, সে যেন তার হাত ও শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করে, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সে বাকশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবে, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্যায় রোধে অন্তর দিয়ে চিন্তা ফিকির করবে (ঘৃণা করবে কাজকে) আর এই সর্বশেষ স্তরটি হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক ।এই স্বাধীনতা তখন পর্যন্ত হরণ করা যাবে না যতক্ষণ না তা ভাল নিয়ম, নৈতিক চরিত্র ও সাধারণভাবে সর্বজন স্বীকৃত আইনের বিরুদ্ধে চলে যায়। বাক-স্বাধীনতা হল মৌলিক বিষয় ।

রাসূল (সা) বলেন :

- إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ أَنْ تَقُولَ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمْ فَقَدْ تَوَدَّعْ مِنْهَا

যদি দেখ যে আমার উম্মত যালেমকে 'যালেম' বলতে ভয় পায় তাহলে সে উম্মতের কথা ছাড় । অর্থাৎ এ উম্মত দিয়ে কোন কাজ হবে না ।

শহীদ শ্রেষ্ঠ হযরত হামযা একদা দেখলেন যে, জনৈক লোক তার প্রতিবেশীনীর উপর চড়াও হচ্ছে, তখন তিনি তাকে উপদেশ দিলেন ও নিষেধ করলেন এবং পরে হত্যা করে ফেললেন । ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যুদ্ধ, সামাজিক জীবন ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের সমাধান সম্পর্কে আমি আর বেশী বলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না । একথা সত্য যে, এগুলোতেও ইসলামের বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চাইতে যুক্তিসংগত ।

এ প্রসঙ্গে আমি আল্লাহর নিম্ন বক্তব্যকে অবশ্যই তুলে ধরব :

لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً الا أَحْصَاهَا -)الكهف

ছোট বড় সব কিছুর পরিসংখ্যান আল্লাহর কাছে আছে। (আল কাহাফ : ৪৯)

পূর্ণতা, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা, স্থায়িত্ব

অন্যান্য মতাদর্শের তুলনায় ইসলামের তিনটি বৈশিষ্ট্য জানাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট 1 প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, পূর্ণতা। বর্তমান ও ভবিষ্যতে সব মানুষের প্রয়োজন পূরণে এ জীবন ব্যবস্থা সক্ষম ।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা। এই আদর্শ জাতীয় জীবনের উচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল স্থায়িত্ব। ইসলামী আইন মানব রচিত আইনের তুলনায় স্থায়ী । স্থান ও কাল ভেদে ইসলামী আইনে মৌলিক বিষয়গুলো পরিবর্তিত না হওয়া সত্ত্বেও সর্বযুগ ও সর্বত্র তা সম্পূর্ণ উপযোগী ।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে :

انَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَانَّا لَهُ لَحفِظُونَ - الحجر

আমরা উপদেশ নাযিল করেছি এবং আমরাই তার সংরক্ষণ করবো ।(সূরা আল হিজর : ৯)

ইসলামের এসব বিভিন্নমুখী বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলো একই উৎসের দিকে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় আর তা হল ইসলাম, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসত তাহলে এতে পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের মত গুণাবলীর সমাবেশ হতো না ।

যুবকদের প্রতি আহ্বান

সব জীবন ব্যবস্থার মহত্ব ও তা কায়েমের পেছনে শক্তির উৎস ছিল যুবকেরা। তারাই ঐসব জীবন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে। মানব রচিত মতবাদ কায়েমের জন্য যদি এমন যুবক পাওয়া যায় যারা সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করে, যৌবনকে বাজী রেখে রাত পর্যন্ত জাগরণ করে, তাহলে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য কি আল্লাহর এমন কোন যুবক পাওয়া যাবে না যারা ইসলামের ঝাণ্ডাকে উপরে তুলে ধরবে, এর দিকে মানুষকে ডাকবে এবং স্বয়ং নিজেরা এর সুফল ভোগ করবে?

হে মুহাম্মদ, ওমর, খালেদ ও বিশ্ব বীরের সন্তানেরা, আপনাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে? দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাত্মক কল্যাণকামী আপনাদের জীবন ব্যবস্থা থেকে আর কোন জীবন ব্যবস্থা বেশী পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ হতে পারে?

বিশ্বাস করুন, আপনারা অন্যদের তুলনায় কম সাহস, কম মর্যাদা ও কম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী নন। আপনারা কিছুতেই রাশিয়া ও চীনের বাতিল আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী যুবকদের থেকে কম

যোগ্যতা সম্পন্ন নন কিংবা আপনারা আমেরিকা, বৃটেন ও হল্যান্ডের ঐ সমস্ত যুবকদের থেকেও নিকৃষ্ট নন, যারা সারা দুনিয়ায় তাদের সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হে অমিততেজা যুবক বন্ধুরা! সত্যের প্রত্যয়দীপ্ত ও গগণবিদারী আওয়াযে ঘোষণা করুন, আপনারা ইসলামের সাথে অন্য কোন ব্যবস্থাকে সমান মনে করেন না এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মতবাদের অনুসরণ করবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হউন যে, আপনার জ্ঞানকে আন্তরিকভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করবেন এবং আপনার যৌবনকে ইসলাম রক্ষার জন্য ওয়াক্ফ করবেন, আপনার সময়কে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারে ব্যয় করবেন। তারপরই আপনারা আল্লাহর সাহায্যের আশা করতে পারেন ।

আল্লাহ বলেন :

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُه ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

যারা আল্লাহকে দ্বীন কায়েমে সাহায্য করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও শক্তিধর । (সূরা হাজ্জ : ৪ 0)

তথ্য সূত্র :

১. ইসলাম একমাত্র দ্বীন (হোসাইন শাকিল) ।

২.ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতীব).

৩.সূরা নাহল.

৪. সূরা আম্বিয়া

৫.সূরা ইব্রাহিম

৬.সূরা বাকারা

৭. সহিহ বুখারী

৮. সহীহ মুসলিম

৯. সূরা নিসা